পরভাপ পত্রিকা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

অনেকদিনের প্রিয়

আর প্রতিদিনই পাচ্ছে নতুন নতুন বন্ধু !

হাল্‌কা
দাগ পড়েনা
পুষ্টি জোগায়...
প্রতিদিন

মোলায়েম,
আঠাহীন,
সুগন্ধময়...
প্রতিদিন

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

বছরের পর বছর,দে'জ এর তৈরী একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন Dey's

PX/KK/B-3/83

সূচীপত্র

কবিতা ও ছড়া

খোকনমণি ● হাসিরাশি দেবী ৪৭
চ্যাপলিন চার্লি ● সমীন্দ্র ভৌমিক ৩১
পিঁপড়ে পুরাণ ● সুরজিৎ ঘোষ ২০
ভদ্দরলোক ● রাণা দাস ২৫
সেরা ডাক্তার ● মধুসূদন পাল ২৫

ধারাবাহিক উপন্যাস

সেদিনের সেই ছেলেটা ● প্রবোধকুমার সান্যাল ৩২
জলমানুষ ● লীলা মজুমদার ২১

বড় গল্প

গুণিন ● নিখিলচন্দ্র সরকার ৩৯

গল্প

ছক্কামিয়ার টমটম ● সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৪
প্যাঁক প্যাঁক ● সুধীন্দ্র সরকার ৬

রূপকথা

শেয়ালী আর ভালুকের গল্প ● মানস মজুমদার ৪৮

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

মজারু প্রাণীর মারত্মক লীলা ● অদ্রীশ বর্ধন ৫১

অভিযান কাহিনী

পোর্টরয়্যালের সন্ধানে ● শ্যামলী বসু ২৬

বিশেষ রচনা

দ্য লাস্ট সাপার ● শৈবাল ভট্টাচার্য ৯
অ্যালিসের স্রষ্টা ল্যুইস ক্যারল ● ঝুমুর কুশারী ৩৮

কলকাতার কোথায় কি

নেহেরু চিল্ড্রেন্স মিউজিয়াম ● কিন্নর রায় ১০

খেলাধূলোর দুনিয়া

দুঃখ সুখের ক্রিকেট ● জয়ন্ত দত্ত ৭১
কলকাতার প্রথম
ফুটবল লীগ ● হান্নান আহসান ৬৫

পুরনো দিনের পাতা

কল্পনা, অনুকরণ ও
অভ্যাসজনিত রোগ ● ভুবনমোহন মিশ্র ৭৩

হারানো দিনের কথা

স্কুলের প্রথম দিন ● [illegible] ৭৫

শব্দকল্প ● পূর্ণেন্দু বেতাল ৯১

কমিকস্

ট্যাপা টেঁপি ● উদয়শংকর গঙ্গোপাধ্যায় ৫০

সবজান্তার দপ্তর

কে কতদিন বাঁচে ● ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ৭৭
মেঘবৃষ্টির লুকোচুরি ● অপরাজিত বসু ৭৯
নিজে করে দেখ ● অরিজিৎ বসুরায় ৮৬
ব্যোমশংকর ● সম্রাট চৌধুরী ৮৪

মজারুর মজলিস

জানো কি না জানিনা ৮৮
আঁকাআঁকি ৮৯
ছবি দেখে ছড়া লেখো ৯০

টাটকা বইয়ের খবর ৯২
খোশগল্প ৯৩

প্রচ্ছদ
ফটো অলকেশ কুমার

প্যাঁক প্যাঁক

সুধীন্দ্র সরকার

বাবা আপিস থেকে ফিরেই বললেন, 'পিকু রুকু, শিগ্‌গির এসো। দেখো কী এনেছি।'

পিকু টয়ট্রেনটা ফেলে রেখেই ছুটে এলো। আর রুকু মায়ের কোলে।

সবে হাঁটতে শিখছে রুকু। মায়ের কোল থেকে নেমে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে যেতেই, বাবা কোলে তুলে নিলেন।

পিকু জিজ্ঞেস করল, 'কী এনেছো বাবা?'

বাবা পিকুর হাতে একটা কাগজের বাক্স দিয়ে বললেন, 'দেখো।'

পিকু বাক্সটা খুলেই লাফাতে শুরু করল, 'কী মজা! নতুন জুতো।'

রুকু বাবার কোলে দুলতে দুলতে বলল, 'তা-তা, তা-তা।'

পিকু জুতো পরতে পরতে জিজ্ঞেস করল, 'রুকুর জন্যে আনোনি?'

বাবা অন্য একটা বাক্স খুলতে খুলতে বললেন, 'এটা রুকুর।' লাল টুকটুকে একজোড়া জুতো বাবা মায়ের হাতে দিলেন।

মা রুকুকে জুতোজোড়া পরিয়ে দিতেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল ও।

'রুকু হাঁটোতো।' বাবা বললেন, 'হাঁটি হাঁটি পা পা।'

রুকু নতুন জুতো পায়ে খুশিতে হাততালি দিতে দিতে এক-পা এক-পা করে হাঁটতে লাগলো।

পিকু অবাক! রুকু যতবারই পা ফেলে, জুতো থেকে হাঁসের ডাক শোনা যায়: প্যাঁক্ প্যাঁক্। প্যাঁক প্যাঁক!

পিকুও নতুন জুতো পরে কয়েক পা

হাঁটল। কিন্তু ওর জুতো থেকে তো কেউ ডাকল না!

ও রুকুর দিকে এগিয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রুকুর জুতোর দিকে। রুকু তখনো হাঁটছিল। আর ওর জুতো থেকে অনবরত হাঁসের ডাক শোনা যাচ্ছিল!

অন্যদিন রুকু হাঁটতেই চায় না। আজ নতুন জুতো পরে থামতেই চাইছিল না। কখনো হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছিল। আবার মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নতুন করে হাঁটছিল। ঘর ছেড়ে বারান্দায়। বারান্দা থেকে উঠোন। উঠোন থেকে আবার ঘরে।

পিকু ভাবতেই পারছিল না, জুতোর ভেতর থেকে কেমন করে হাঁস ডাকে! তাই মুখ কাঁচুমাচু করে জিজ্ঞেস করল বাবাকে, 'বাবা, রুকুর জুতো থেকে হাঁস ডাকছে কেন? আমারটাতো ডাকছে না।'

বাবা একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, 'রুকু তো ছোট, তাই ওর জুতো ওই রকম।'

উত্তরটা পছন্দ হলোনা পিকুর, 'আমি বুঝি খুব বড়?' অভিমান হলো ওর।

'না, তা নয়। তবে রুকুর চেয়ে তো বড়।' বাবা পিকুকে আদর করলেন, 'তোমাকে কি এখন ওই জুতো মানায়? স্কুলের ছেলেরা ওই জুতো পরে নাকি?'

'কিন্তু ওর জুতোতে হাঁস ডাকছে কী করে?' নাছোড়বান্দা পিকু।

বাবা কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। তবু হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখেছো তো, হাঁস কেমন জলে চলে। তোমার ছোট্টভাইকেও তো ওইরকম মাটির ওপর চলতে হবে। তাই হয়তো জুতোওয়ালা ওর জুতোতে দুটো হাঁস ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে ও হাঁসের পিঠে ভর দিয়ে মাটিতে হাঁটতে শেখে।'

পিকু বাবার কথাগুলো হাঁ করে শুনছিল। বাবা ফের বললেন, 'আর হাঁটার সময় পায়ের চাপ পড়তেই হাঁসদের ব্যথা লাগে। অমনি প্যাঁক-পেঁকিয়ে ডেকে ওঠে।'

বাবার কথা শুনে হেসে ফেললো পিকু। বলল, 'হাঁসগুলো কতদিন ওইভাবে আটকে থাকবে! পালিয়ে যাবে না?'

'যতদিন না রুকু ভালোভাবে হাঁটতে শিখছে, ততদিন তো থাকবেই।' বাবা বললেন।

পিকুর মনে পড়ল সিন্ডারেলার ছোট্ট জুতোর কথা। কিন্তু, হাঁসদুটোকে দেখা যাচ্ছে না কেন! ওইটুকুনি জুতোর মধ্যে হাঁসেরা থাকে কী করে! বাচ্চা হাঁস কী অত ছোট হয়? বড়দের মতো বাবাকে বলল, 'আমি তো ওইভাবে হাঁটতে শিখিনি। আমি তো নিজে নিজে হেঁটেছি।'

'কে বললে?' বাবা হাসলেন, 'তুমিও ছোটবেলায় প্যাঁক্ প্যাঁক্ জুতো পরে হাঁটতে শিখেছিলে। অত ছোটবেলার কথা কি কারো মনে থাকে?'

পিকু আর কথা বলল না। ও শুনতে পেলো বাগানে দুটো হাঁস ডাকছে। তার মানে রুকু বাগানে হাঁটছে। পিকু ওর নতুন জুতো পরে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল।

রবিবার। ইস্কুল ছুটি। দুপুরবেলা পিকু একবার সারা বাড়িটা টহল দিলো। রুকু ঘুমচ্ছিল মার কাছে। বাবা একমনে মাথা নীচু করে কী যেন লিখছিলেন, আর তুতি বলে ওদের বেড়ালটা, বাগানের পাঁচিলে গোল হয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল।

পিকু বারান্দায় পা রাখল। টেবিলের নীচে যেখানটায় জুতোগুলো পর পর রাখা আছে, এগিয়ে গেল সেদিকে। রুকুর নতুন জুতো-জোড়া হাতে তুলে নিলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল হাঁসটা কোথায় লুকিয়ে আছে। খুঁজে পেলো না! তারপর চেষ্টা করল জুতোটা পায়ে ঢোকাতে। তাও হলো না। বেশ কিছুটা সময় চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। অর্ধেকটা

পূজা সংখ্যা

দারুনভাবে সেজেগুজে তৈরী হচ্ছে পূজা সংখ্যা 'সবজান্তা মজারু'। রঙচঙে এই পত্রিকা নিয়ে কাড়াকাড়ি যে পড়বেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূজা সংখ্যায় থাকছে ছ'-ছ'টা সত্যিকারের উপন্যাস। এবারে পাঁচটা উপন্যাসের খবর জানাচ্ছি। বাকিটার খবর পরের সংখ্যায়–

ছ'টি উপন্যাস

সমরেশ বসু

গোয়েন্দা গোগোলের নতুন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবিক আবেদনের মর্মস্পর্শী উপন্যাস

আনন্দ বাগচী

জমজমাট গোয়েন্দা উপন্যাস

শেখর বসু

ডগ ট্রেনিংয়ের ওপর এক আশ্চর্য উপন্যাস

কল্পবিজ্ঞানের জাদুকর

অদ্রীশ বর্ধন

টারজন ও টাইম মেশিন নিয়ে এক চনমনে সায়েন্স ফিকশন

এবং ●●●

শুভম ১৩ কিড স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১৬

দা লাস্ট সাপার

শৈবাল ভট্টাচার্য

মধ্যযুগ শেষ হয়েছে। ইউরোপে তখন রেনেসাঁ, নতুন যুগ এসেছে। সেই নতুন যুগে বিখ্যাত এক শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁর নাম আজও আমরা মনে রেখেছি। তিনি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। তাঁর দুটো ছবির কথা এখন পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই জানেন। তার একটার নাম 'মোনালিসা' বা 'লা গিয়াকোন্ডা' আর অন্যটা হচ্ছে 'দ্য লাস্ট সাপার' বা শেষ ভোজন। অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল এই পরের ছবিটা আঁকতে গিয়ে। শিল্পীরা তো মডেল ব্যবহার করেন, ছবির চরিত্রের মতোই দেখতে আর একটা লোককে সামনে বসিয়ে শিল্পী আঁকেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিও তাই-ই করতেন। 'দ্য লাস্ট সাপার' হচ্ছে যীশুর মৃত্যুর পূর্বরাত্রে শিষ্যদের সঙ্গে শেষ ভোজনের ছবি–যীশু আর তাঁর বারোজন শিষ্য একসঙ্গে বসে আহার করছেন। প্রথমেই আঁকতে হবে যীশুর ছবি। কিন্তু যীশুর মতো দেখতে লোক কোথায় পাওয়া যায়? চোখমুখ থেকে পরম পবিত্রতার জ্যোতি বেরোচ্ছে–এমন লোক কি সহজে মেলে? বহু খোঁজাখুঁজির পর একজনকে পাওয়া গেল। হুবহু যীশুর মতোই দেখতে লোকটিকে। দেহ থেকে যেন স্নিগ্ধ আলো বেরোচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় পরম শুদ্ধাচারী। তাঁকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকা শেষ হল। বছর তখন ঘুরে গেছে।

এরপর একে একে পিটার, থোমা, জন, জেমস্, টমাস্ প্রভৃতি এগারোজন শিষ্যের ছবি আঁকা শেষ হল। আর কেবল একজন শিষ্যের ছবি বাকি–জুদাস। জুদাস হচ্ছে সেই শিষ্য, যে মাত্র তিরিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিল। তার মুখ হবে পাপে ভারাক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে আছে। মুখে তার থাকবে ক্রূর হাসি। মডেল খোঁজা শুরু হল। মাসের পর মাস কেটে গেল, তবু শিল্পী ঠিক লোক পেলেন না। শহরের জঘন্যতম বস্তিতে ঘুরতে শুরু করলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। সেখানে খুন-খারাপির কোন শেষ নেই। শহরের সমস্ত বস্তি যখন প্রায় খোঁজা শেষ, তখনই হঠাৎ শিল্পীর চোখে ধরা পড়লো ঠিক লোক। চোখমুখ তার পাপের অন্ধকার মেঘে কালো, যেন পৃথিবীর সমস্ত পাপ সে করে ফেলেছে। তাকে স্টুডিওতে বসিয়ে ছবি আঁকা শেষ হল। তারপর? তারপর মডেল জুদাস উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'শিল্পী! আমাকে আপনি চিনতে পারেননি। বছর কয়েক আগে এই চেয়ারে বসিয়ে আমাকে দেখেই আপনি এঁকেছিলেন যীশুর ছবি। তখন সত্যিই আমি পবিত্র ছিলাম। কিন্তু মাঝের এই সময়টাতে পৃথিবীতে হেন পাপ নেই যা আমি করিনি। আপনি লোক চিনতে না পারলেও আপনার মনে, আপনার তুলিতে আমার সমস্ত পাপ ধরা পড়েছে।

নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম

কিন্নর রায়

চৌরঙ্গী রোডের ওপর তিন তলা বাড়ি, নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম। একটু এগোলেই সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল। চারপাশে এক রাশ সবুজ নিয়ে দাঁড়িয়ে।

মিউজিয়ামের সামনে পাতাল রেলের খোঁড়া খুড়ি। দুমাদ্দুম শব্দ। লোহার মোটা পাতের ওপর আলোর দাঁত, কাটা হচ্ছে। মাটির স্তূপ সুড়ঙ্গ ইট কাঠ পাথরে–এক ধুন্ধুমার অবস্থা। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে এই বুঝি কোন যুদ্ধ শেষ হলো! পাতাল রেলের এই কর্ম-দাপটে কমেছে মিউজিয়াম দেখতে আসা লোকজন। সব মিলিয়ে এখন অব্দি মিউজিয়াম-দেখা মানুষের সংখ্যা উনতিরিশ লক্ষের ওপর।

১৯৭২ সালের ১৪ নভেম্বর, জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনে তোমাদের মতো যারা কচিকাঁচা, তাদের জন্যে সংগ্রহশালার দরজা খুলে গেল। সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধন করলেন তিনি-ই।

ভিত পোঁতা হয়েছিল ১৯৬৭ তে। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল। জ্যোতি ভট্টাচার্য শিক্ষামন্ত্রী। তিনিই প্রথম ইঁটটি গেঁথেছিলেন।

তিনতলা এই বাড়িতে আছে তোমাদের জন্যে হরেক মজা। তাই বলে বড়রাও আসার ব্যাপারে বাদ নেই। ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে ভীড় বড়দেরও। ৬৪ টি দেশের ৬০০-রও কিছু বেশি পুতুল এখানে কাঁচ বন্দী। সবই উপহার হিসেবে পাওয়া, কিনতে হয়নি।

নানা দেশের রকমারি মজার পুতুল। দোতলায় শো কেসের ভেতর দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, আফগানিস্তান, আর্জেন্টিনা, চেকো-শ্লোভাকিয়া, ভারত, লেবানন, পোল্যান্ড, রুমানিয়া,

মালয়েশিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, ইথিওপিয়া, পূর্ব আর পশ্চিম জার্মানি, আয়ারল্যান্ডের পুতুল। যে দেশের যেমন মানুষ সে দেশের পুতুলের চেহারা রং আর পোশাক ও সেইরকম।

কোন কোন দেশের পুতুলের পাশে আছে সে দেশের পতাকা আর ডাকটিকিট। এত সুন্দর সুন্দর, দেখলেই মনে হয় হাতে তুলে আদর করি।

টিকিট কেটে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বাঁ দিকে পুতুল খেলনার ঘর। সে সব দেখে ডান দিকে ঘুরলেই আর একটা ঘর। সেখানে ভিডিও খেলার ব্যবস্থা। তোমাদের ভীড়। হুড়ো হুড়ি। পয়সা দিলেই খেলা চালু। মোটরের দৌড়, আরও কত কত মজা। এইসব খেলনা অবশ্য মিউজিয়ামের নয়। অন্য কোম্পানি রেখেছে। ভিডিও খেলনার পাশে দু'টো খেলনা ট্রেন। বাচ্চারা চড়ে বসে কলকাঠি টিপলেই আলো জ্বলে ওঠে। নড়ে চড়ে। তবে দৌড়য় না। এদের একটার নাম রাজধানী এক্সপ্রেস। এ ঘরেই আছে কলের হাতী, ঘোড়া। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের মডেল। মডেলে কলকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। আমেরিকার দেয়া মহাকাশ-যানের অনেকগুলো খেলনা-মডেল। আকাশ-অভিযানের গোটা ব্যাপারটাই দেখা যাবে।

কলকাতা বন্দরের মডেল আছে এখানেই। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত ঘন্টায় একবার মডেল নড়েওঠে। চালু হয়ে গেলে ব্যাপারটা আরও মজার। জাহাজ বন্দরে ভেড়া থেকে আরম্ভ করে দেখা যায় সব কিছুই। দেখে শুনে খুউব ভালো লাগবে তোমাদের ও।

তিন তলায় পুতুল গ্যালারিতে আছে রাশিয়া, স্পেন, সুইডেন, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, সিরিয়া, তাইওয়ান, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, হাঙ্গেরী, চীন আর গ্রীসের পুতুল। হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের পুতুলেররাও এখানেই। যেমনটি দেশের মানুষজন তেমনটি পুতুলের পোশাক-চেহারা। গাড়ি টানে স্পেনের পুতুল। রাশিয়ার ভালুক মজার চোখে তাকিয়ে। ভিয়েতনামী পুতুল বাঁক কাঁধে, মনে হবে এখুনি চলা হবে শুরু। মনে হতে পারে এলাম এ্যালিসের সেই মজার দেশে। কোন লড়াই ঝগড়া নেই। সবাই চুপচাপ। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে।

বিজ্ঞানের নানা মজার খেলনা, ব্যাপারস্যাপার ঘুরতে ঘুরতে দেখা যাবে। আগুন ওগরানো রাক্ষসী, চ্যাচামেচি করা কলের ভালুক, কাঁচের গায়ে মুখ লাগিয়ে শব্দ করলে চলতে শুরু করে পুঁচকে খেলনা

□ আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ □

রবীন্দ্রসংগীত ঃ কাব্য ও সুর

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সংগীত—এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্র সাহিত্যের ও রবীন্দ্র সংগীত-সাহিত্যের সামগ্রীক আলোচনা অথবা সুবিন্যস্থ বিশ্লেষণ সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। ২০·০০

আসরের গল্প

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিগত দিনের স্মরণীয় গুণী শিল্পীদের সংগীত জীবন তথা নানা বৈচিত্র্যময় আসরের প্রাণবন্ত, অন্তরঙ্গ ও তথ্যপূর্ণ পরিচয় এই গ্রন্থে বিধৃত। ১৫·০০

ভুজঙ্গ অভিধান

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাপ !

সাপ কথাটা শুনলেই আমরা চমকে উঠি। কিন্তু এদের সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি আমরা। সাপ সম্বন্ধে সবরকম তথ্য সম্বলিত অসাধারণ এই গ্রন্থ। ৯·০০

সতীদাহ

গোরাচাঁদ মিত্র

এক প্রস্তুত অপার্থিব সুখ ভোগের আশায় ভারতীয় হিন্দুনারীরা কিভাবে শিকার হয়েছেন পৃথিবীর নৃশংসতম প্রথার—বহুতথ্য এবং বহু দুষ্প্রাপ্য দলিল এই গ্রন্থের আকর্ষণ। ২০·০০

লড়াই
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১০·০০

কবি জীবনানন্দ
□ শুদ্ধসত্ত্ব বোস ৮·০০

একটি কামনার মৃত্যু
মীরা বালসুব্রামনিয়ম ৮·০০

শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই উপন্যাসের অভিনব বিষয়, অভিনব চরিত্রমালা এবং পট-ভূমিসহ রোমাঞ্চকর অভিযানের লৌকিক অলৌকিক উপলব্ধি বাংলা সাহিত্যে আবার এক মহাজীবনের খবর পৌঁছে দিল আমাদের।

১ম খণ্ড ৩০·০০ ২য় খণ্ড ২০·০০
(২য় সংস্করণ)

ভক্তকবীর

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস

ভক্তিস্রোতের অন্যতম ভগীরথ যুগমানব কবীরের অলৌকিক জন্মকাহিনী, অন্যান্য অলৌকিক কাহিনী এবং তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার সমস্তদিক সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। ১৮·০০

পুরানো কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ী

সুভাষ সমাজদার

পুরানো বাড়ীর ভুতুরে কাণ্ডকার-খানার গায়ে কাঁটা দেওয়া এক একটি ঘটনাই শুধু নয়—প্রেত অধ্যুষিত বাড়ীর বহুনথিপত্র ঘেঁটে লেখক নানা ইতিহাস বের করেছেন। (২য় সংস্করণ) ৮·০০

পুরুষোত্তম

আলোকময় দত্ত

আদিবাসী কোলিয়ারী চেল সমা-জের ঘৃণা প্রতিহিংসা, প্রেম ভাল-বাসার এক বাস্তব ছবি এই গ্রন্থে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ১৫·০০

চক্রান্তের বিভীষিকা

সি, আই, এ

শেখর রায়

জগতজোড়া বিভীষিকার তিন অক্ষরের নাম সি, আই, এ। সি, আই, এ-র বিভিন্ন গোপন অভিযান এই গ্রন্থের পটভূমি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, এই গ্রন্থের আতঙ্কঘন উপন্যাস বিগত দিনের ইতিহাস নয়-সমকালীন বাস্তব ঘটনা। ২০·০০

ভিয়েতনাম (গেরিলা যুদ্ধের কাহিনী)
উইলফ্রেড বার্চেট ১৮·০০

আখের স্বাদ নোনতা ২০·০০

মুসোলিনী ও মুক্তিফৌজ ১৫·০০

দিল্লীতে এসেই ১৫·০০

বলিভিয়া ১৫·০০
সৌরীন সেন

বন্যাকন্যা ২৫·০০

বঙ্গভঙ্গ
সমুদ্রগুপ্ত ২৫·০০

ওই ছায়া
বিমল কর ৬·০০

চতুষ্ক ২৫·০০
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

ভক্ত কবীর
ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস ১৮·০০

ট্রেন। শব্দ আলো বিদ্যুৎ নিয়ে হরেক মজার বিজ্ঞান-খেলনা।

তিনতলায় মডেলে রামায়ণ আর মহাভারত। কাঁচের শো কেসে আলো-আঁধারি আর ক্ষুদে মাটির মডেল। দেখলে ভাববে এই বুঝি নড়ে উঠল। রাম-রাবনের যুদ্ধ, তাড়কা রাক্ষসী বধ, ঘটোৎকচের মৃত্যু, হনুমানের সাগর পার হওয়া, লঙ্কা দহন, সুভদ্রা হরণ, অর্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ, এমন জীবন্ত, না দেখলে বিশ্বাস হয়না। রামায়ণ মহাভারতের মডেল তৈরী করেছেন কয়েকজন শিল্পী। গোটা ব্যাপারটার পরিকল্পনা যুগল শ্রীমলের। তিনিই এই সংগ্রহশালার ডিরেক্টর।

যুগলবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল পাতাল রেলের কাজের জন্যে বছরে একলক্ষ মিউজিয়াম দর্শক কমেছে। আগে বছরে তিন লক্ষ লোক আসতেন দেখতে।

মিউজিয়ামের উদ্যোগে বিজ্ঞান শিবির হতো। সারা ভারত থেকে প্রতিনিধিরা আসতেন। বাংলাদেশ থেকেও। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এই মিউজিয়ামের 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা' খুব নাম টাম করে ফেলেছে। বহু ছেলেমেয়ে আসে প্রতিযোগিতায়।

এই সংস্হার উদ্যোগে 888 টা গ্রামে নিরক্ষর বাচ্চাদের না না বিষয়ে কাজ শেখানো হচ্ছে। রবীন্দ্র সরোবরে চিলড্রেন্স কমপ্লেক্স তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে। আরও বহু কাজ শুরু হয়েছে। শেষ হলে বোঝা যাবে

কি বিশাল ব্যাপার চলছে। ফি মাসে 'শিশুভবন' পত্রিকা বেরোয় এখান থেকে। চারপাতা বাংলা। চারপাতা ইংরেজি।

দোতলা তিন তলা ঘুরে আবার সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসো এক তলায়। এখানে টিকিট কাউন্টার, ওজন নেয়ার যন্ত্র, আইসক্রিমের দোকান। ছোট মিটিং হতে পারে, এমন একটা হলঘরও আছে। সঙ্গে স্টেজ।

গরমে দিব্যি একটা আইসক্রিম হাতে নিয়ে মুখে লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে আসতে পারো। তোমাদের দুচোখে তখন খেলনা-পুতুল আর বিজ্ঞান ভাবনার অজস্র ঝিকিমিকি রং। চিকমিক স্মৃতি।

ফটো □ অলকেশ কুমার

এক নজরে সব খবর

কোথায়: ৯৪/১ চৌরঙ্গী রোড।
কলকাতা-৭০০ ০২০।

কিভাবে যাবে: উত্তর বা দক্ষিণ থেকে আসা যে কোন বাসে রবীন্দ্র সদন স্টপে নামতে হবে। হাওড়া শেয়ালদা থেকে আসার নিয়মও এক।

কবে খোলা: সোমবার বন্ধ, বাকি সব দিন বেলা এগারোটা থেকে সাতটা।

দর্শনী: পঞ্চাশ পয়সা। কোলের বাচ্চারও টিকিট লাগে।

ছক্কামিয়ার টমটম

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এ মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কা মিয়ার টমটম ছাড়া উপায় ছিল না। ঝড়বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশমাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কা মিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে এক চিলতে টিমটিমে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে আর এগিয়ে আসবে। মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুৎ এক আওয়াজ টং লং,...টং লং.... টং লং। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি–তেরপলের চৌকো একটা টাপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়নো এক টাট্টু।

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কা মিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল গলিয়ে চৌকো টাপরে ঢুকলেই

নিশ্চিন্ত। আবার টলতে টলতে চলতে থাকবে ছক্কা মিয়ার টমটম–টং লং....টং লং.... টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজি 'ট্যান্ডেম্' থেকে– যে গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যেতো। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কামিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়েছিল টমটম।

ছক্কা মিয়ার চেহারাটি কিন্তু ভারি বদরাগী। ঢ্যাঙা, টিঙটিঙে, রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রঙ রোদপোড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া। হাড়জিরজিরে লম্বাটে গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময় সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ নেড়িকুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশোই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড়মাংস দলা পাকাতে থাকে বলেও না, কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায়? ছক্কা মিয়া এটা বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি।....

সেবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে ছোটমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল। আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী? না– আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটমামা বেজার মুখে বললেন, 'বরাতে আবার হতচ্ছাড়া ছক্কামিয়ার টমটম আছে। বাপ্স্!'

ওই টমটমে কখনও চাপিনি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম, 'খুব মজা হবে। তাই না ছোটমামা?'

ছোটমামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'মজা হবে! বুঝবে ঠ্যালাটা'খন।'

ঠ্যালাটা কিসের বুঝলাম না আগেভাগে। দেখলাম, ছোটমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে বারবার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন, 'খুব ঝড়বৃষ্টি হবে! কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলাম। বড়দা অত করে বললেন, তবু থাকলুম না। ছ্যা ছ্যা, আমার কী আক্কেল!'

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনও কিন্তু ঝড়বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। লাস্ট বাস সেই এগারোটায় ছেড়ে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কা মিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটমামা টমটমের পেছনদিকে তেরপল তলে ঢুকে ডাকলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী? উঠে আয়। এক্ষুনি একগাদা লোক এসে ভাল জায়গা দখল করে ফেলবে যে।'

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার ওপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটমামা পর্দাটা ফাঁক করে রাখলেন। একটুপরে আরও জনাদুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটমামা বললেন, 'ওই যা বলেছিলুম। হল তো?'

ছক্কামিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল, 'আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা! এবার রওনা দিই।' তার ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলাম কেন ছোটমামা 'বাপ্স্' বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপ্স্'! হাড়গোড় মড়মড়িয়ে ভেঙে যাবার দাখিল। সাইরে হাওয়ার হইচই আর মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কামিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজী হয়ে উঠছে। একটু পরেই দড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টাপরের তেরপলে পড়তে শুরু করলে ছোটমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কা মিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর বৃষ্টির ছাঁট লাগবে না?

রাস্তাটা ঘুরে রেল লাইন পেরুলে দুধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড়বৃষ্টিটা ছক্কা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উল্টে গিয়ে রাস্তার ধারের গভীর খালে নাকানিচুবানি খাবে। আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে টলতে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ–টং লং....টং লং....টং লং....। কখনও ছক্কা মিয়ার টাট্টুঘোড়া বিকট চিঁ হিঁ হিঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তারিফ করে আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন, 'পক্ষিরাজের বাচ্চা!'

এতক্ষণে তেরপলের টাপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরবে কোথায়? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামাকাপড়। একসময় ছোটমামা হঠাৎ বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, 'আঃ! হচ্ছে কী' হচ্ছে কী মশাই? আমার ওপর পড়ছেন কেন?'

'আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমার ওপর পড়লেন?'

'কী বাজে কথা বলছেন? আমায় ঠান্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক? আপনি মানুষ, না বরফ?'

'আমি বরফ? আপনিই তো বরফ। ইস। কী ঠান্ডা! হি হি হি! হাড় অব্দি জমে গেল দেখছেন না!

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিকখিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল, ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর যায়, বুঝলেন তো মশাই? ছক্কা মিয়ার টমটমের এই নিয়ম। খিক্ খিক্ খিক্ খিক্।'

এমন বিদঘুটে হাসি কখনও শুনিনি। কিন্তু এঁর শ্বাসপ্রশ্বাসও যে বরফের মতো হিম। বললুম, 'ইস! একটু সরে বসুন না! বড্ড ঠান্ডা করে যে!

লোকটা ভারি অদ্ভুত। সে ওই বিদঘুটে খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে আরও যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ছোটমামা! ছোটমামা!'

কিন্তু ছোটমামার কোনো সাড়া পেলাম না। টাপরের ভেতরটা ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম, 'ছোটমামা! কোথায় তুমি?'

লোকটা সেই খিক্ খিক্ হাসির মধ্যে বলল, 'আর ছোটমামা বড়মামা! মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে।'

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটমামাকে খুঁজলুম। স্যুটকেসটা হাতে ঠেকল। কিন্তু সত্যি ছোটমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পর্দাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢুকছে। আমি প্রচন্ড চেঁচিয়ে বললম, 'ছক্কা মিয়া! ছক্কা মিয়া! গাড়ি থামাও! গাড়ি থামাও!'

পেছনের সওয়ারি ফের সেই বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পর্দা ঠেলে সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামা খামচে ধরলুম। 'গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও বলছি।'

এতক্ষণে যেন ছক্কা মিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল, 'কী হয়েছে বাবুমশাই?'

'ছোটমামা পড়ে গেছেন কোথায়।'

ছক্কা মিয়া বলল, 'বালাই ষাট! পড়বেন কোথায়? ঠিকই আছেন। খুঁজে দেখুন না।'

'নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কিনা বলো!'

'সামনে একটা মন্দির আছে। সেখানে থামাব।' ছক্কা মিয়া চাবুক নেড়ে ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে-সেখানে থামালে ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই! বুঝলেন না? ওইখেনে থামিয়ে আপনার

ছোটমামাকে খুঁজবেন বরঞ্চ।'

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ছক্কা মিয়ার পাশ দিয়ে লাফ দিলুম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লুম। বুদ্ধি করে ছোটমামার স্যুটকেস আর আমার কিটব্যাগটাও দুহাতে নিয়েছিলাম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, ছক্কা মিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক ডেকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়তে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত আর ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কা মিয়া!

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্ট শার্ট ভিজে চবচব করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা আর কি!

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে, কে?'

ছোটমামার সাড়া এল।'অন্তু নাকি রে?'

আমি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম, 'হ্যাঁ।তোমার কী হয়েছিল ছোটমামা?'

ছোটমামা আটচালায় ঢুকে বললেন, 'কী হবে আবার? যা হবার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কক্ষনো ছক্কা মিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।'

ছোটমামা আমার কাছে স্যুটকেসটা দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।'

'কিন্তু লোকটা কোথায় রইল?'

হাসলেন ছোটমামা। 'ওকে তুই লোক বলছিস এখনও? ওটা কি লোক নাকি?'

'তবে কে?'

'বুঝলিনে? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। থাকগে, এখন রাতবিরেতে ওনিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কী জানিস অন্তু? রাতবিরেতে অমন দু একজন সওয়ারি ছক্কা মিয়ার টমটমে উঠে পড়বেই পড়বে। তারপর কী করবে জানিস? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে আমিও ওর সঙ্গে তেরপলের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়েছি।'

'তারপর? তারপর ছোটমামা?'

'তারপর আর কী? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু জুডো যা সব এ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি, চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুঁড়লম যে একেবারে বিশফুট গভীর খালে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোন বাজপড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে।' ছোটমামা হাসতে হাসতে গায়ের জামা খুলে নিঙড়ে নিলেন। তারপর বললেন,'ঘণ্টা তিনেক কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিঙড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে ফ্যাল। বাপ্‌স্!'

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনকার সেই সওয়ারিও কি লোক নয়,'লোক? সেই'লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল? অন্য 'লোকটার মতো?

আমার মুখ দিয়ে ছোটমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল, 'বাপ্‌স্!....'

ছক্কা মিয়ার টমটমে তারপর আর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কি না আমি পুরোপুরি সাবালক, একরাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলুম, লাস্ট বাস চলে গেছে।

স্টেশনবাজার তখন নিঃঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে একটুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চাওলা সবে ঝাঁপ ফেলার যোগাড় করছিল, আমাকে দেখে বুঝি তার দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল, 'বাবুমশাই তাহলে যাবেন কিসে গদাইতলা?'

'কিসে আর যাব? বরং দেখি, যদি ওয়েটিং রুমে কাটানো যায়।'

চাওলা মুচকি হেসে বলল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।'

ছক্কা মিয়ার টমটমের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। সেবার ঝড়-বৃষ্টি ছিল, তাছাড়া আমার বয়সও ছিল কম। ছোটমামাও বড় গপ্পে মানুষ ছিলেন।

হনহন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কা মিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরী। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে

একটুকরো চটের জামা। বললুম, 'গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কা মিয়া?'

ছক্কা মিয়া ইশারায় টমটমে ছড়তে বলল।

আজ আর কোনো সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি নড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতোই আছে। এমন কী ছক্কা মিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায় নি। আর সেই অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ,টংলং....টংলং....টংলং....!

কনকনে ঠান্ডা হাওয়া তেরপলের ঘেরাটোপের ছেঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্যক্ত করছিল। জড়সড় হয়ে কোণা ঘেঁষে বসে রইলুম। সামনেকার মোটা ছেঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশামাখানো জ্যোৎস্নায় ঝিমধরা মাঠঘাট চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাছতলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে, আর মাথায় পড়েছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মতো একটা ন্যাড়া তালগাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, 'রোখো, রোখো!' অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবমতো সামনে দু'ঠ্যাং তুলে একখানা চিঁ-হিঁ ছাড়ল। তারপর ছক্কা মিয়ার গলা শুনলুম। 'দারোগাবাবু নাকি? সেলাম, সেলাম!'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো এক দারোগাবাবু। বললেন, 'রোসো।' সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টাপরের ভেতর ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢুকেই আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন, 'কে? কে?'

বললুম, 'আমি।'

'আমি? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি?' বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধদৃষ্টে আমাকে দেখে নিলেন। নামধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বলে কথা। সব শুনে উনি বললেন, 'আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনও দেখিনি।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'কলকাতায় আছি বহুকাল। তাই দেখেন নি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার?'

'বংকুবিহারী রায়।'

'আসামী ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?' ওঁকে খুশি করার জন্যই বললুম।

বংকু দারোগা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুম! ব্যাটা এক দাগী বেগুন চোর ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুনক্ষেতে দুজন সেপাই নিয়ে ওত পেতেছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তালগাছের ডগায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতেই পারলুম না। তখন সেপাই দুজনকে তালগাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।'

দাগী বেগুন চোর এই শীতকালে সারারাত

তালগাছের ডগায় বসে আছে! কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দুজনের কথা ভেবে আমার উদ্বেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা!'

'আহা মানে?' আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বংকু দারোগা বললেন, 'হুম! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এতরাতে চাপলেন যে! আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটেনা বলে ছক্কা মিয়া মড়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে!'

'বলেন কী! তাহলে তো ভয়ের কথা।' অবাক হয়ে বললুম, 'সত্যি ভয়ের কথা। আগে জানলে....' কথা কেড়ে বংকু দারোগা বললেন, 'হয়তো জেনেশুনেই চেপেছেন। কিচ্ছু বলা যায় না।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুঁটকো রোগা চিমসে বাসি মড়ার মতো লোক সচারচর দেখা যায় না কি না।'

এবার, আমার খুব রাগ হল। 'কী বলতে চান আপনি?'

'রাতবিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না মশাই!'

হাত বাড়িয়ে বললুম, 'এই আমার হাত। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত!'

বংকু দারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে। 'বাপ্‌স্‌! এযে বেজায় ঠান্ডা!'

'ঠান্ডা হবে না? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে?'

'না মশাই। এমন রাতে বিস্তর সিঁদেল চোরের হাত পাকড়েছি। তারা কেউ এমন ঠান্ডা ছিল না।'

'কী? আমায় সিঁদেল চোর বললেন!'

বংকু দারোগা গলার ভেতর বললেন, 'সিঁদেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।'

আর সহ্য হল না। খাপ্পা হয়ে চেঁচালুম, পুলিস হোন আর যাই হোন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।'

দারোগাবাবু ফের মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে বললেন, 'উঁহুঁহুঁ! বড্ড এগিয়ে এসেছেন। সরে বসুন! সরে বসুন বলছি!'

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই বা সহ্য হয়! 'টর্চ নেভান,' বলে টর্চটা ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধ হয় ভুল হল। আর বংকু দারোগা বিকট গলায় 'ভূত! ভূত!' বলে চিক্কুর ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টাপরের একপাশের জরাজীর্ণ তেরপলের ওপর কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলুম। কানের পাশ দিকে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচন্ড বেগে। পলকের জন্য দেখলুম কুয়াশাভরা নীলচে জ্যোৎস্নায় কালো টমটম দূরে সরে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভূত এক শব্দ, টং লং....টং লং....টং লং....!

ভাগ্যিস, রোডস দফতরের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল। আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। ডাকাডাকি করলে বাড়ির লোকেরা লণ্ঠন লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, 'কী বলছেন বাবু? ছক্কা মিয়ার টমটম পেলেন কোথায়? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কা মিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে! ভাগ্যিস, টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু। সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কান্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে ভালয় ভালয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।'

বংকু দারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়েই দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে! আহা বেচারা!

কী ঘটল, তা পরদিন শুনলুম। বংকুবাবু তখন হাসপাতালে। লোকে বলছে, আসামী ধরতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে কোমরের হাড় ভেঙেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক, আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে, তার জন্য দায়ী স্টেশনবাজারের সেই ধড়িবাজ চাওলা। কেমন হেসে বলেছিল, 'ছক্কামিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।' সব জেনে শুনেও কী অদ্ভূত রসিকতা।

অবশ্য এমনও হতে পারে, সে বলেছিল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন।' আমিই হয়তো ভুল শুনেছিলুম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ!....

ছবি □ দীরেন শাসমল

পিঁপড়ে পুরাণ

সুরজিৎ ঘোষ

কুট কুট কুট্টিস
হাতে পায়ে ফুটছিস
কেরে তুই ?
ওমা লাল পিঁপড়ে !
দেখি দেখি মুখখানা
কামড়েই গেছে জানা
লক্ষীটি নয় ওরা
খুব যে।

সারাদিন ঘুর ঘুর
আস্ত পাটালি গুড়
তার মাঝে গর্ত
কে করেছে ?
নয়তো চিনির দানা
নিয়েও ওদের নানা
দুষ্টুমি করবার ইচ্ছে।

যদি দেখ সারি দিয়ে
চলেছে খাবার নিয়ে
বুঝবে ঢুকছে
সব গর্তে।
আর যদি দলে দলে
ওড়ে তো কথায় বলে
পিঁপড়ের পাখা ওঠে
মরতে।

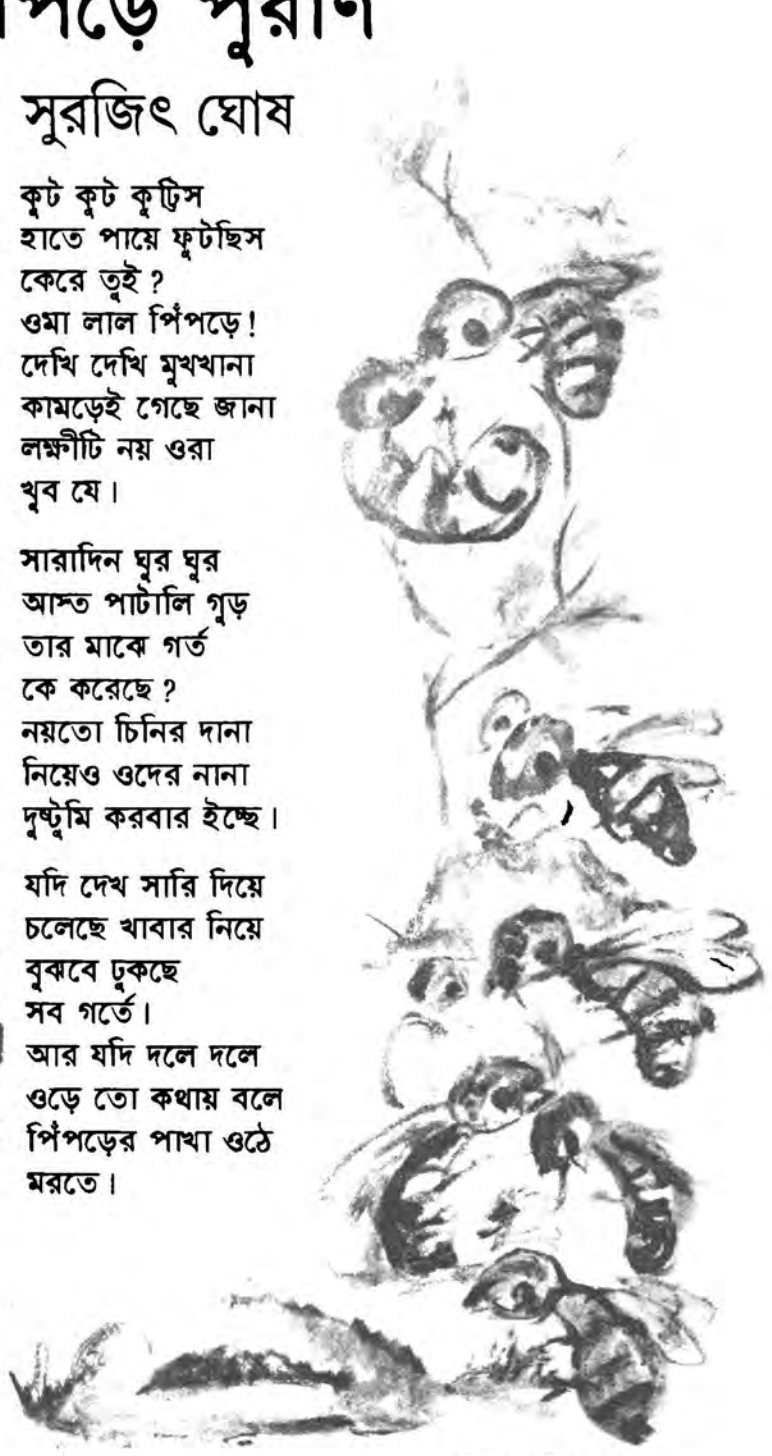

ছবি □ সব্যসাচী সেনগুপ্ত

জলমানুষ

লীলা মজুমদার

আগে যা হয়েগেছে

খেপী আর হুগলীর মাঝখানে বোম্বেটেদের খাল,তার একপাশে ভুতুড়ে ব-দ্বীপ। যার টিলার ওপর থাকে গাঙ্গুলীদের চৌকিদার মঙ্গলরাম আর তার ভাইপো ঝড়। ঝড়ের বাবা ছিল মুন্সিপালের মেথর, মারা গেছে।

এক সন্ধ্যায় ভাঙা মন্দিরের নীচে কাদায় আটকে থাকা একটা ছোট্ট নৌকোয় ঝড় আবিষ্কার করলো জলমানুষকে। পিঠে তার ভয়ঙ্কর জখমের দাগ।

খালপারের গঙ্গু ঝড়ের বন্ধু। তারা দু-জনে জলমানুষকে নিয়ে এলো একটি নিরাপদ আশ্রয়ে, সেখানেই শুরু হলো তার গোপন চিকিৎসা। জলমানুষ আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে গঙ্গু আর ঝড়ের সঙ্গে গড়ে উঠল তার বন্ধুত্ব।

জলমানুষের নৌকো এখন জল-পুলিসের হাতে। তাই সে চায় নিজেকে গোপন রাখতে, কি জানি কি হয়! এদিকে জলমানুষের থলি উধাও, যে করে হোক এখন সে থলি তাদের উদ্ধার করা চাই-ই চাই। কিন্তু কি আছে সেই থলিতে, এ রহস্য জলমানুষ ছাড়া কে আর জানে?

চোরের মতো চেয়ে রইল দুজনে ঝড়ের দিকে, কারো মুখে কথা নেই। ঝড় একটু আশ্চর্য হয়ে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাঁড়িমুখ কেন? জলদাদা, খাওয়াও আমাদের। তোমার চাকরি ঠিক হয়ে গেছে। ১লা থেকে জয়ন্ করবে। এই দু-তিন দিনে শরীরটা সারিয়ে ফেল। রান্নাঘরেই খাবে আর একশো টাকা মাইনে। শিক-কাবাব পরটা, সামী কাবাব, মটন রোস্ট, চপ, কাটলেট, পুডিং, সব করে দিতে হবে কিন্তু। ভালো কথা, মণিলাল কান্তি-মামাকে চাবি ফেরত দিয়েছে। কান্তিমামা খুশি হয়ে ওকে পাঁচ টাকা বখ্শিস্ দিয়েছে। তাই দিয়ে আমরা আজ মুড়ি নারকোল ছোলার ডালের বরফি খেয়েছি।'

গঙ্গু শুনে, অবাক! 'এ্যাঁ, হাড় কেপ্পন কান্তিমামা, সবাই বলে। সে একেবারে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল!'

ঝড় হাসল, 'মণিলাল ওকে বলেছিল, খালের কাদায় কুড়িয়ে পেয়েছে। আমাদের কাউকে জড়ায়নি। নাকি এই অঞ্চলে কারো বাড়িতে এমন সিন্দুক, আলমারি, তোরঙ্গ, ডেস্ক বা দরজা নেই, যা ঐ চাবি দিয়ে খোলা যায় না। মণিলাল বলেছে–পৃথিবীতে এমন তালা নেই যা কানাইমামা খুলতে পারে না। ওর কাছে জেলখানার তালাও কিছু নয়। যাকে বলবে ছাড়িয়ে আনতে পারে। তবে খরচা লাগে। ওর খাবারের দোকানের আর মুদিখানার কি এমন লাভ?

ওটা একটা মুখোশ। পুলিস ইন্সপেক্টরকে দেখাবার জন্য।' এই বলে ঝড় খুব হাসতে লাগল।

জলমানুষ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি কি এই সব সমর্থন কর?'

ঝড় মাথা নাড়ল, 'মেথরের ছেলের সাধ্যি কি যে দুষ্কৃতকারীদের দলে ঢোকে। বাঃ, তাদের জাত যাবে না?'

জলমানুষ বলল, 'কাদের? মেথরের ছেলের, না দুষ্কৃতকারীর?'

ঝড় সে-কথার উত্তর দিল না। খালি বলল, 'জানো দাদা, কিছুদিন জেল খাটলে সব অন্য রকম দেখায়?'

জলমানুষ বলল, 'জানি। আমিও জেল খেটেছি।'

গংগুর চক্ষুস্থির। ওস্তাদের দলের একটা নিয়ম হলো, কেউ জেল খাটতে পাবে না। ধরা পড়লে প্রায় সবাইকেই ওস্তাদ কান ভাংগিয়ে, ঘুষ খাইয়ে, সাক্ষী দাঁড় করিয়ে, ছাড়িয়ে আনত। আর তা যদি না পারত তো সেই লোকটাকে একেবারে গুম্ করে দিত। হাজতের ভিতর থেকে সে হাওয়া হয়ে যেত। তার বাড়ির লোকরা একে ওকে জিজ্ঞেস করলে, ওস্তাদের দলের অন্য ছেলেরা বলত, 'এখানকার জল-হাওয়া ভালো না, তাই সে হিমালয়ের চা-বাগানে গেছে।' নাকি নাম ভাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তারা চিঠিপত্র-ও লিখত। কিন্তু আর কখনো কেউ তাদের চোখে দেখতে পেত না।

বুকের নীচে পেটের তলা থেকে ফোঁস্ করে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো গংগুর। সে বলল, 'তাহলে আমার মা-বাবাকে কানাইমামা ছাড়িয়ে আনেনি কেন? তারা কেন দশ বছর জেল খাটল? তারপর কোথায় গেল কেউ জানে না।'

ঝড় বলল, 'পাদ্রী ভারি দয়ালু। তোর মা-বাবার নাম, মামলার তারিখ, এই সব লেখা দলিল নিশ্চয় আছে? সেটা দিলেই তিনি সব খবর এনে দিতেন।'

গংগু মুখ ঢেকে বলল, 'না, না, না, না। কেন ছাড়ায়নি, তাও আমি জানি। মামাই বলেছে। যারা ওস্তাদের দলে যোগ না দেয়, তাদের সাহায্য করে না কেউ।'

ঝড় ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'কি এত আপশোস্ কচ্ছিস্ বল্ দিকিনি? জেল ভেঙে পালালে চিরকাল দাগী আসামী বলে চেনা হয়ে থাকতে হয়। তার চেয়ে মেয়াদ খেটে আবার ভালো মানুষ হওয়া ঢের ভালো।'

জলমানুষ বলল, 'তা কেউ হয় বলে তো শুনিনি। জেল-খাটাদের ব্যাপারই আলাদা। কোনো ভালো মানুষ তাদের চাকরি দেয় না। একবার জেল খাটলে তো চিরকাল দাগী হয়ে থাকল! এ কি তুমি জানো না, ঝড়? একমাত্র উপায় হলো জেলে না যাওয়া।'

ঝড় হাসল 'জেলে যাবার মতো কাজ না করা বল।'

জলমানুষ বলল, 'তাতেও যদি বা উদ্ধার পাওয়া যায়, জেল খাটলে কখনো না।'

'তুমি তো জেল খেটেছ। তোমাকে তো দাগী মনে হচ্ছে না–।'

এই অবধি শুনে গংগু বলে উঠল–'সেই থলিটা কে নিয়ে গেছে, ঝড়।' বলে মুখ ঢাকল।

একটুক্ষণ ঘরময় চুপচাপ। তারপর ঝড়ের গলা শোনা গেল, 'তাহলে এখন কি করাটা হবে শুনি?'

গংগু মুখ তুলে বলল, 'তুই-তুই আর আমাকে বিশ্বাস করবি না। আমি–আমি খেপী নদীতে ডুব দেব।'

ঝড় হেসে ফেলল, 'দূর বোকা! তুই যেমন মাছের মতো সাঁতার কাটিস্, তোর পক্ষে ডোবা শক্ত। তাছাড়া ডুববি কেন? ওতে কি থলি ফিরে আসবে? আপাততঃ দাদাকে চান করিয়ে, খাইয়ে, সুস্থ কর। পরশু সন্ধ্যায় ওকে মণিলালের কাছে পৌঁছে দেব কথা দিয়েছি। ওর ভোর থেকে ডিউটি। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই দাদা ভোজ দেবে।'

অমনি বাতাসটা হাল্কা হয়ে গেল। ঝড় আরো বলল, 'আর দেখ্, এই বাড়িতে, কি বাগানে, কি পুরনো ঘাটে কোথাও বোম্বেটেদের গুপ্তধন রাখা আছে। সেটি যদি উদ্ধার করতে পারিস্, তাহলে গাংগুলী-বাবুকে বলে, এখানে একটা স্কুল খোলা যায়। সেই স্কুলে যত সব ছোট জাতের ছেলেমেয়েরা– যাদের ছুঁলে তোদের জাত যাবে– তাদের তুই লেখাপড়া শেখাবি!'

গংগু আকাশ থেকে পড়ল। 'আমি নিজে একটা মুখ্যু, আমি কি শেখাব, ঝড়?'

ওর চোখ দুটো চকচক করতে লাগল, 'তবে হ্যাঁ, গোয়ালের কাজ জানি, সেটা শেখাতে পারি। ছিপ তৈরি শেখাতে পারি। মাছ-ধরা শেখাতে পারি। বাগান কোপাতে পারি। কুয়ো থেকে জল তুলতে পারি। আমি-আমি একেবারে অকেজো নই রে, ঝড়। যদিও সারা জীবন চেষ্টা করলেও তোর মতো হতে

পারব না।' এই বলে গংগু সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

কান্ড দেখে জলমানুষ অবাক! 'আরে! এই ছেলেটা দেখছি চোখের জলের ফাউন্টেন পেন! এই কি আমার চাকরি পাওয়াতে আনন্দ করা? এসো গংগু, আমার ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলে দাও। ঘা শুকিয়ে গেছে। যে ছোরা মেরেছিল, তার মুখ দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু ডান হাতটা মুখস্থ করে রেখেছি। পরে কাজে দিতে পারে।'

হঠাৎ সবাই গম্ভীর হয়ে গেল।

ঐ দুটো দিনে সত্যি সত্যি নতুন চামড়া গজিয়ে ঘাটার দাগ ছাড়া কিছু বাকি রইল না। তবে সারা জীবন শীতের সময় জলমানুষের পিঠের ঐ জায়গাটা কন্‌কন্‌ করত। ঐ দু-দিন ঝড় একবার-ও এলো না। বারেবারে জলমানুষ আর গংগু কুলুঙ্গির বই নামিয়ে দেখেছিল। যা গেছে, সে কি আর অত সহজে ফেরে? মনটা খারাপ হয়ে গেছিল গংগুর। অপু মাসিমা বেজায় ভালো; গংগা-যমুনারা সন্দেহের বাইরে; এ কথা ঝড়-ই বলেছিল। কিন্তু ওস্তাদ বলত কেউ সন্দেহের বাইরে নয়। তেমন তেমন লোভে পড়লে সকলেরি পতন হয়। সব মানুষেরি ধর্মের দাম আছে। কারো বেশি, কারো কম। গংগুর ধর্মের এক কানা-কড়িও দাম নয়, সে কি আর গংগুর অজানা! ওর মা-বাবা জেলে গেছিল। ভালো মানুষরা কি মিছিমিছি জেলে যায়? তার পরেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল! জলমানুষ বলে, ভালো ব্যবহার করলে পুরো মেয়াদ জেল খাটতে হয় না; দু-এক বছর আগেই ছাড়া পায়। মা-বাবার তো দশ বছরের বেশি-ই হয়ে গেছে। তারা তবে গেল কোথায়? তারা যদি শোনে গংগুও ওস্তাদের দলে

ভিড়েছে, তারা কি ভাববে ? মামী বলত তারাও নাকি ওস্তাদের চর ছিল। পালাতে চেষ্টা করত।

এই সব কথা ভাবল গংগু ঐ দুদিন। জলমানুষকে কিন্তু কেমন খুশি-খুশি মনে হচ্ছিল। বোধ হয় কাজকর্মের আশায় মনটা ভালো হয়ে গেছিল। গংগুকে কেউ কাজ দিলে গংগুও ঐ রকম খুশি হবে। একশো টাকা না-ই দিল, ওর খাওয়া-পরা চলে গেলেই হলো।

অবসর পেলেই দুজনে হন্যে হয়ে গুপ্তধন খুঁজেছিল। জলমানুষের দক্ষতা দেখে গংগুর ভক্তি হলো। সমস্ত দেয়ালে টোকা দিয়ে দেখত কোথাও ফাঁপা শব্দ বেরোয় কি না। মেঝেতে চোরা পথ আছে কি না। পা ঠুকে দেখতে আধা-দিন কেটে গেল। জলমানুষ বলত– 'এটাই মালিকের শোবার-ঘর ছিল, চোরা-পথ, কি চোরা-কুঠরি, এইখানেই থাকতে পারে।'

খুঁজতে খুঁজতে একটা অদ্ভুত জিনিস বেরিয়েও পড়ল। চানের ঘরের ভারি লোহার টব দুজনে মিলে সরিয়ে দেখে, তার তলায়, মেঝেতে চৌকো দাগ। ঐ দাগের এক ধারে জোরে চাপ দিতেই সে-দিকটা নেমে গেল। নীচে সরু পাথরের সিঁড়ি দেখা গেল। গংগুর নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ঝড়কে না বলে যাওয়া ঠিক হবে না। এ বিষয়ে দুজনে একমত। ঐ সিঁড়িই বোধ হয় পুরনো ঘাটে যাবার পথ। ঝড় ওটার কথা জানলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই বলে হুড়মুড় করে নেমে গেলেই তো চলবে না। বাড়িটা ঝড়ের সম্পত্তিও নয়। মালিক-ই বা কি বলবেন ? এত রকম কথা মনে হচ্ছিল বলে গংগু নিজেই আশ্চর্য হলো।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলায় ঝড় এসে হাজির হলো। সে-দিনটা শনিবার। ঝড়ের দেড়টায় ছুটি হয়েছিল। গংগু মিনিটে মিনিটে ভূতবনের দিকে তাকাচ্ছিল। জলমানুষ যাবার জন্য রেডি। রেডি আবার কি ? যার পরনে জামা পাজামা পর্যন্ত ধার করা, তার গোছ গাছ করার কি আছে ? বিকেলে চানটান করে জলমানুষ যাবার জন্য তৈরি। তার কালো থলিটি পর্যন্ত বেহাত হয়ে গেছে। তবে গংগু মনে মনে জানত যে থলি থাকলেও, সেটিকে জলমানুষ সংগে নিয়ে যেত না। ঝড় আসবার আগে একবার নিজের অজান্তে বলে ফেলেছিল, 'দাদা, একটা কথা বলব ?'

'কি কথা বল।'

'তুমি যেন আবার বেফাঁস কিছু করে ফেলে ঝড়কে বিপদে ফেলো না।'

জলমানুষ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে বলল, 'জানো, চীন দেশে একটা প্রবাদ আছে–তুমি যদি কারো প্রাণ বাঁচাও, তাহলে সেই লোকটা যতদিন বাঁচবে, তোমাকে তার জন্যে দায়ী হতে হবে। তোমার আর ঝড়ের মতো দু-দুটো ত্রাণ কর্তা পেয়ে আমি কি সহজে তোমাদের হারাতে রাজি হবো ভেবেছ ?'

কথাটা ঠিক। ঝড় একবার যাকে আশ্রয় দেয়, জীবনে তাকে ত্যাগ করে না। এ-কথা ও কি করে জানল, সে নিজেই জানে না।

ঝড় সেদিন ওদের সংগে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করল। অপু মাসিকে পায় কে! ঝড় যা যা ভালোবাসত সেই সব রান্না করেছিল। পাবদা মাছের ঝাল, লাল চালের ঝরঝরে ভাত, তেঁতুলের অম্বল, ফুলুরি, সুজির পায়েস। আজ মনে হচ্ছিল ঝড়ের আর জলমানুষের ঘাড় থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেছে। গংগু ভাবছিল সে মুখ্যু মানুষ তাই সব বুঝে উঠতে পারে না। এত দিন পরে হাতে সময় পেয়েছে, তাকের ওপর গাংগুলী বাবুর বাংলা বইগুলো রয়েছে। এখনো যদি খানিকটা লেখাপড়া শিখে নিতে না পারে, তা হলে সেটা নিজেরই দোষ। এতকাল খালি মনে মনে অন্যকে দোষ দিয়ে এসেছে, মা-বাবা কেন ছেলে ফেলে জেলে গেল ? মামা-মামী কোনো দিনও ভালো ব্যবহার করল না– এই সব মনে হতো।

রাত আটটার পর ঝড় জলমানুষকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সংগে একটা ছোট্ট টিনের অ্যাটাচি কেস। তাতে কয়েকটা কাপড়-জামা, দাড়ি কামাবার জিনিস, কাপড়-কাচার সাবান, মাথার তেল, চিরুণী, তোয়ালে, গামছা। তাই দেখে জলমানুষ হো-হো করে হেসে বলেছিল, 'ঝড় তুমি সব জানো। তুমি একটি রত্ন।'

ঝড়-ও একটু হেসেছিল, 'আমি না। কাকা দিয়েছে। কাকার অ্যাটাচি। সব সময় গোছানো থাকে। তুলে নিয়ে গেলেই হলো।

ঝড় আর গঙ্গুর গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে পড়ল জলমানুষ। এই বার অনেক বিপদের মুখোমুখি হ'তে হ'তে 'ওস্তাদ'-এর সামনে হাজির হ'য়ে গেল। আগামী সংখ্যায় তারই ছমছমে বিবরণ।

ছবি □ বীরেন শাসমল

ভদ্দরলোক

রাণা দাস

চুপচাপ থাকে সে কথা-টথা কয়নে,
শত্তুর আছে তার বামে ও ডাইনে।
ব্যাম-ট্যাম করে তাই ভয়-টয় পায়নে,
ঘুটঘুটে রাত্তিরে শুধু কোথা যায়নে।
গলাটা ভালো ছিল গান তবু গায়নে,
হুলোটা খেপে যাক এটা সে চায়নে।
মাথা কিছু আছে তার অংকে ও আইনে,
বদনাম দেবে তো ফেলে দেবে ফাইনে।

সেরা ডাক্তার

মধুসূদন পাল

এই যে ওষুধ দিনু নিয়ে যাও চট্‌পট্‌
খেয়ে ফেলো যদি কভু কান করে কট্‌কট্‌।
কাশি কি হাঁপানি হলে বেটে খাও সত্বর
এ ওষুধে বাছাবাছি নেই কোনো পথ্যর।
একটা কথা শুধু হবে জেনো মানতে
কখন খাবার বিধি হবে সেটা জানতে।
অমাবস্যা-রাতে যদি চাঁদ হয় দৃষ্ট
তাহলে ওষুধ দেবে ফল একনিষ্ঠ।
তা না হলে, হলেও বা কলেরা কি যক্ষ্মা
এ ওষুধে কিছুতেই পাবে নাকো রক্ষা।
অসুখ হবে না ভালো নিয়ম না মানলে
চট্‌পট্‌ বাড়ি যাও–সকলই তো জানলে।

পোর্ট রয়্যালের সন্ধানে

শ্যামলী বসু

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ক্যারিবিয়ান সাগরের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জামাইকার দুর্গ ঘেরা পুরনো রাজধানী পোর্টরয়্যাল ছিল ইংরেজ ও জলদস্যুদের মস্ত ঘাঁটি। ওয়েলসের এক জলদস্যু নেতা হেনরী মর্গান ওখানকার হাওয়ায় ভয় ছড়িয়ে রাখত। দলবল নিয়ে অবাধে সে লুট-পাট চালাত আশেপাশের যত স্পেনের বন্দর আর উপনিবেশের ওপর। সমুদ্রে স্পেনের বাণিজ্য জাহাজের ওপরেও চড়াও হতো। যত রাজ্যের লুটের মালপত্র এনে তুলতেন পোর্ট রয়্যালে।

পেটি রয়্যালের দোকান-পাটে সোনা-দানা, দামী কাপড়-চোপড়, মণি-মুক্তোর ছড়াছড়ি। চারিদিকের বাণিজ্য জাহাজ ভীড় করত ঐ সব মালপত্র সস্তায় কিনে নেবার জন্যে।

খুন-জখম মারামারি ছিল পোর্ট রয়্যালের রোজকার ঘটনা। জাহাজী দস্যুদের লুটের মালপত্র বেচা-কেনা করে দোকানীরা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। আবার জলদস্যুদের পয়সাকড়ি বেশি থাকলেই তারা খেয়ে-দেয়ে হৈ-হৈ করে সেই পয়সা উড়িয়ে দিতো। পোর্ট রয়্যালেই ছিল রাজার মস্ত গুদামবাড়ি। বাছা বাছা জিনিসপত্র ঠাসা থাকত সেখানে।

হেনরী মর্গানের সাহস আর বুদ্ধি দেখে ইংল্যান্ডের রাজা তাকে জ্যামাইকার গভর্নর করে দিলেন। গভর্নর হয়ে হেনরীকেও জলদস্যুদের শাসন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। এমনি করেই কাটছিল পোর্ট রয়্যালের দিনগুলো।

ষোলোশো বিরানব্বুই সালে হেনরী মর্গান মারা যাওয়ার পর জন হোয়াইট হলেন জ্যামাইকার অস্থায়ী গভর্নর। এক দুপুর-বেলায়, তখন বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি, সেন্টপলস্ চার্চের রেক্টর রেভারেন্ড এমানুয়েল হীথের সঙ্গে গল্প করছিলেন হোয়াইট সায়েব। হঠাৎ তাঁদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল।

রেভারেন্ড হীথ আঁতকে উঠলেন: 'হায় ভগবান! একি।'

'কোনো ভয় নেই।' বললেন জন হোয়াইট, 'সামান্য ভূমিকম্প। এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু কিছুই ঠিক হলো না। তিন মিনিটের মধ্যে ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল মাটি। উত্তাল হয়ে উঠল সমুদ্রের জল। দূর পাহাড়ের চূড়াটা ভীষণ শব্দে উড়ে গিয়ে সারা আকাশ আগুনে আগুনে জ্বলন্ত উনুনের মতো হয়ে উঠল। তিন মিনিটেই প্রচন্ড ভূমিকম্পে

টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল ইংরেজদের উপনিবেশের সেরা শহর পোর্ট রয়্যাল, শহরের তিন ভাগের দু-ভাগ তলিয়ে গেল সমুদ্রে। মাটিতে দেখা গেল বড় বড় ফাটল। হাঁ করে সেগুলো গিলে ফেলতে লাগল ভীত মানুষ-গুলোকে। চারদিকে শুধু আর্তনাদ। কত জাহাজ, নৌকো তলিয়ে গেল জলের তলায়।

ব্যবসায়ী লুইস্ গ্যালডির পা-য়ের তলার মাটি হঠাৎ চিরে গিয়ে পাকে আটকে ধরল। নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু আবার ভূমিকম্পের প্রবল ঝাঁকুনিতে তিনি ছিটকে পড়লেন সমুদ্রের জলে। কোনো-মতে সাঁতার কেটে একটা নৌকা আঁকড়ে ধরে প্রাণে বাঁচলেন তিনি। এরপর আরো অনেক দিন বেঁচে ছিলেন লুইস গ্যালডি।

একটা জাহাজের মেরামতি চলছিল জাহাজ ঘাটায়। ঢেউয়ের প্রবল ঝাপটায় জাহাজটা তীরে উঠে এসে আছড়ে পড়ল। আশ্চর্য-ভাবে বেঁচে গেল তার নাবিকেরা।

বেঁচে গেলেন রেভারেন্ড হীথ আর জন হোয়াইটও। যদিও দু-হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারালেন এই ভূমিকম্পে।

প্রায় আড়াইশো বছর পরে জলের তলায় হারিয়ে যাওয়া ওই শহরটিকে খুঁজে বার করতে চাইলেন এডুইন লিঙ্ক। আমে-রিকা যুক্তরাষ্ট্রের নামী মানুষ। বিমান এবং সমুদ্রযান দুটো সম্বন্ধেই তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা। যন্ত্রপাতিও বোঝেন ভালো। আর নেশা, দুর্গমের অভিযান।

এডুইন লিঙ্ক আর তাঁর স্ত্রী ম্যারিয়াম তাঁদের নিজস্ব জাহাজ নিয়ে জ্যামাইকা এলেন তলিয়ে যাওয়া পোর্ট রয়্যাল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে। জলের তলায় খুঁজে পেলেন পোর্ট রয়্যালের সব থেকে বড় দুর্গ ফোর্ট জেমসের শক্ত দেওয়াল। জলের থেকে উদ্ধার করলেন একটি বড় কামান।

এডুইন বুঝলেন, যদি সত্যিই হারিয়ে যাওয়া পোর্ট রয়্যালের খোঁজ-খবর নিতে হয়, তাহলে আরো ভালো করে প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে। তার জন্যে চাই সমুদ্রতলে কাজ করতে পারে এমন অভিজ্ঞ লোক, দরকার আরো উন্নত যন্ত্রপাতি, আর টাকাকড়ি।

দুটি নামকরা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলো সাহায্য করবার জন্যে। এডুইন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে পোর্ট রয়্যাল সম্বন্ধে অনেক খবর পেলেন। জ্যামাইকার রেকর্ড অফিস থেকেও পাওয়া গেল নানান তথ্য এবং পুরনো ম্যাপ। অনেক খুঁটি-নাটি পরীক্ষা করে এডুইন পুরনো শহরের একটি নিখুঁত ম্যাপ তৈরি করলেন। তারপর তাঁর জাহাজকে সবরকমে এই অভিযানের উপ-যোগী করে তোলার দিকে মন দিলেন। ৯১ ফিটের জাহাজটির নাম 'সি ডাইভার'। দুই ডিজেল মোটর চালিত জাহাজ বারো জন সংগী নিয়ে অভিযান শুরু হলো। গভীর সমুদ্রে অভিযান চালানোর উপযোগী নানান সরঞ্জাম যোগাড় করা হলো। অ্যাকোয়া ল্যাঙ, স্কট ল্যাঙ, মুখোস, ব্যাঙ-মানুষের পোষাক, রবারের পোষাক, দস্তানা এবং সমুদ্রের তলা থেকে জিনিস-পত্র তুলে আনার নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, কম্পাস আর জলের গভীরতা মাপার অতি আধুনিক যন্ত্র ইকো সাউন্ডার। জলের তলা থেকে কামান প্রভৃতি ভারী জিনিস তোলার জন্যে রাখা হলো মজবুত কপিকল। জলের নীচের পলিমাটি কাঁকর নুড়ি এইসব সরাবার জন্য জাহাজের গায়ের বজরায় রাখা হলো বিদ্যুৎ চালিত একটা এয়ার লিফ্ট বা ড্রেজ যন্ত্র। তার দশ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ দিয়ে জলের নীচের পলিমাটি, নুড়ি, কাঁকড় সমুদ্রের জলের সংগে মিশে পিচকিরির মতো আছড়ে পড়তে লাগল বজরার ডেকের ওপর।

সব তোড়জোড় সেরে উনিশশো উনষাট সালের জুন মাসে, বারো-জনের এই অভিযাত্রীর দলটি ক্যারিবিয়ান সাগরের অতল জলে কাজে নামলেন। এডুইন দল-নেতা। এছাড়া আছেন, অবসর প্রাপ্ত অভিজ্ঞ নৌঅফিসার ক্যাপ্টেন উইমস্, এঞ্জিনীয়ার ডুবুরী কুর্টস্কট, ফটোগ্রাফার এলগিন সিয়াম্পি, এডুইনের স্ত্রী ম্যারিয়াম, ছেলে স্কেলটন এবং আরো তিনজন ডুবুরী। বন্ধু বান্ধবেরা কিম্বা এই অভিযান আগ্রহী অনেকেই মাঝে মাঝে এসে কিছুদিনের জন্যে এদের সাহায্য করতেন। এলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের মেন্ডেল পিটারসন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ডাক্তার চার্লস অ্যাকোয়াড্রো। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সোসাইটির লুইস মার্ডেন এলেন জলের তলার ছবি তোলার কাজে হাত লাগাতে। এছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ছ-জন পাকা ডুবুরীও এলেন। ডুবো শহরের রহস্য উদ্ধারের কাজ শুরু হলো।

'সি ডাইভারে'র সংগে ছিল ছোট্ট লঞ্চ: 'রীফ ডাইভার' অগভীর জলে কাজ করার জন্যে। ক্যাপ্টেন উইমস্, কুর্ট স্কটকে সংগে নিয়ে তাতে চেপে ইকো সাউন্ডার দিয়ে চারিদিকের জলের গভীরতা মেপে ফেললেন। যতটা সম্ভব ফোর্ট জেমসের দেওয়ালের ওপর ওপর

ফ্ল্যাগ লাগানো বয়া পুঁতে ফেললেন। তারপর আর এক দুর্গ ফোর্ট কালহিলের চারপাশের দেওয়াল খোঁজা শুরু করলেন। ঠিক হলো দুই দুর্গের মাঝখানের গভীরতা তারপর মাপা হবে। ম্যাপ দেখে মোটামুটিভাবে পুরনো শহরের সীমারেখা বুঝে নিয়ে ফোর্ট জেমসের কাছাকাছিই একটা জায়গায় কাজ শুরু হলো।

প্রথম যেদিন ড্রেজের কাজ শুরু হলো, সকলের মনেই দারুণ উৎকণ্ঠা আর আশা। এয়ার লিফট্ চালু হতেই এক ঝলক কাদা মাখা নোনা জল আছড়ে পড়ল বজরার ডেকে। অভিযাত্রীরা ঝুঁকে পড়লেন তার ওপরে। যদি কিছু সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসে।

না, তেমন কিছুই উঠল না। উঠে এলো ভাঙা চীনেমাটির বাসনের টুকরো, ইট-পাথর-যার কোনোটাই পুরনো নয়। দু-চার দিন বৃথা উত্তেজনায় কাটল। তাই ম্যারিয়ামের পরামর্শ মতো ম্যাপ দেখে নোঙর তুলে জাহাজ সরিয়ে নেওয়া হলো রাজার গুদাম ঘরের দিকে।

বলেইছি, রাজার গুদাম ঘরে ঠাসা থাকতো নানান জিনিসপত্র আর কাপড়চোপড়, চিনি, তামাক। গুদামটা লম্বা ছিল। ঠিকমতো জায়গায় খোঁজাখুজি করলে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে।

প্রথমদিন এয়াল লিফট্ চালানো মাত্র জলের সঙ্গে উঠে এলো ভাঙা ইটের টুকরো, মাটির পাইপ, ভাঙা কাটের বোতল, ভাঙা ডিস এমনি আরো কত কী। এয়ার লিফট্ যখনই চালু হলো, জলের তলায় নলের মুখের কাছে ডুবুরীরা পালা করে হাতড়ে খুঁজত পুরনো ভঙ্গুর জিনিস, যাতে নলের ভিতর দিয়ে ওপরে যাবার সময় সেগুলো ভেঙে না যায়।

তেমনভাবেই পাওয়া গেল লম্বা হাতল দেওয়া পিতলের ঝাঁঝরি হাতা, ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটা পাত্র, কয়েকটা দস্তার চামচ, ভাঙ্গা থালা এবং সতেরোশো শতকের পানীয়ের বোতল—গোল-গোল পেট মোটা, সবুজে কালো রঙের।

একদিন জলের তলা থেকে উঠে এসে কুর্ট বললেন, 'আজ প্রায় নীচে এক জায়গায় ভাঙা দেওয়ালের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। জায়গায়টা জুড়ে আশে পাশেও আরো দেওয়ালের চিহ্ন আছে। সব দেওয়ালগুলোই চিড় খেয়ে ফাঁক হয়ে গেছে।'

অভিযাত্রীদের কাছে এটা একটা দারুণ খবর। ভূমিকম্পের ধ্বংসের কাছাকাছিই তাঁরা যে কাজ শুরু করেছেন এটা সকলেই বুঝলেন।

পরেরদিন এড্ইন ডুবুরীদের বললেন 'মেটাল ডিটেকটর নিয়ে জলের তলায় খোঁজাখুঁজি করতে। যন্ত্রের নির্দেশ মতো এক জায়গায় ডুব দিয়ে ডুবুরীরা তুলে আনলেন দস্তার মতো একটা হাঁড়ি। কাদা-নুড়ি বোঝাই সেটা। তোবড়ানো হাঁড়ির কাদা-মাটি সাবধানে সরিয়ে পাওয়া গেল দুধ সাদা ক'টা হাড়ের টুকরো। ঘিরে দাঁড়ানো অভিযাত্রীদের এড্ইন বললেন, 'ভূমিকম্পের সময় এই হাঁড়িতে কচ্ছপ আর গরুর মাংসের স্টু রান্না হচ্ছিল। যাদের জন্যে রান্না হচ্ছিল তাদের আর খাওয়া হয়নি।'

ডুবুরীরা কদিন সেখানেই বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলেন। পাওয়া গেল আরো রান্নার বাসন। যেমন একটা বড় দস্তার থালা। জলের ওপর তুলে আনতে আনতেই সেটা গুঁড়িয়ে গেল। পাওয়া গেল, পুড়ে

কালো হয়ে যাওয়া ইট, চৌকো টালি, লোহার শিক। বোধহয় একটা অগ্নিকুন্ড ছিল এখানে। দস্তার আরো কিছু চামচ আর থালার সঙ্গে পাওয়া গেল পেতলের মোমবাতিদান, যাঁতা কাঠের হামাম দিস্তা, আরো কত কি। সেইসঙ্গে পাওয়া গেল অজস্র পেট মোটা বোতল আর তামাক খাবার পাইপ।

ডুবুরীরা অনেক কিছুই কিন্তু তুলে আনতে পারলেন না। ইঁটের দেওয়ালে পাথরের মতো সেঁটে গেছে কত কাচের বোতল, রান্নার পাত্র। জোর করলেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। অভিযাত্রীরা বেশ বুঝতে পারলেন তারা কোনো বড় রান্নাঘরে কাজ করছেন। হয়তো সেটা কোনো বড় সরাইখানা বা ফোর্ট জেমসের রান্নাঘর ছিল। একজন বিশেষজ্ঞ বললেন, 'ডাঙার ওপর থাকলে এসব জিনিস কবেই ভেঙে নষ্ট হয়ে যেতো। জলের তলায় চাপা ছিল বলেই ওগুলো পাওয়া গেল। জলের তলার পুরাতত্ত্বের এই হলো সুবিধে।'

নৌবাহিনীর ডুবুরীরা যোগ দেওয়াতে কাজের গতি বেড়ে গেল। ম্যাপ দেখে ফোর্ট কালহিল আর ফোর্ট জেমসের প্রতি বর্গ ফুট জমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে মাপ ঠিক করে দিলেন। জলের গভীরতা মাপলেন। ফোর্ট জেমসের ভাঙা দেওয়ালের আশপাশ থেকে তারাই তুলে আনলেন ঘোরানো যায় এমন কামান। চার পাউন্ডের কামানের গোলা, সীসার বল।

অভিযাত্রীর কাজ দেখতে এবং তাদের উৎসাহ দিতে আসতেন জ্যামাইকার ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর বার্ণার্ড লুইস। একদিন এলেন জ্যামাইকার গভর্নর স্যার কেনেথ ব্ল্যাকবার্ণ। 'সি ডাইভার'-এর ডেকে সাজানো হাঁড়ি-কুড়ি, পেটমোটা বোতল, কামান, গোলা দেখতে দেখতে তিনি অভিযাত্রীদের নানা প্রশ্ন করলেন।

তখুনি এক ডুবুরী তুলে আনলেন একটা বড় পেট মোটা বোতল, ছিপি আঁটা। ভেতরের তরল পদার্থ তখনও ভরা রয়েছে।

ছিপি আঁটা বোতল এই প্রথম পাওয়া গেল। তাই সকলে উৎসুক হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কী আছে ভিতরে।

অভিযাত্রী ডঃ অ্যাকোয়াড্রো ছিপির ভিতরে দিয়ে হাইপোডারনিক ছুঁচ চালিয়ে তুলে আনলেন একটু হলদে তরল বস্তু। তার সামান্য মুখে ঠেকিয়েই এডুইন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'উঃ কী বিশ্রী স্বাদ। নুনেভরা ভিনিগার যেন।'

আর এক ডুবুরীও কাছাকাছি জায়গা থেকে তুলে আনলেন ওই রকম আর একটি ছিপি আঁটা বোতল। মহা উৎসাহে পরের দিন ঐখানেই খোঁজা-খুঁজি শুরু হলো। প্রবালে ঢাকা অনেক ধাতুর জিনিসপত্র পাওয়া গেল। জলের অনেক তলায় ভাঙা দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে পাওয়া গেল বিশফুট এক জাহাজের কাঠামো। খুবই মজবুত সেটা। এতদিন পরেও জলের তলায় এত মজবুত আছে কি করে ভেবে অনেকেই অবাক হলেন।

এডুইন বললেন, 'নদীর পলিমাটি পড়ে জায়গাটা কাদায় নরম হয়ে গেছে। সেই নরম মাটির তলায় ছিল বলেই কাঠামোটা অ্যাতো ভালো আছে।

সেইখানে পাওয়া গেল আংটা দেওয়া লোহার ওজন, একটা বড়, একটা ছোট দাঁড়িপাল্লা, পাওয়া গেল কুড়ুলের মাথা, নানান যন্ত্রপাতি, কয়েকটা তলোয়ারের মুঠি আর ছুরির বাঁট। ফলাগুলো অবশ্য নোনাজলে অনেক আগেই ক্ষয়ে গেছে।

অভিযাত্রীরা আবিষ্কার করলেন ঢালাই লোহার লম্বা একটা কামান। জল থেকে তুলে গায়ের প্রবাল পরিষ্কার করে দেখা গেল কামানটির গায়ে খোদাই করা রয়েছে: 'স্পেন, পঞ্চদশ শতক।'

কামানটি কোথা থেকে এলো, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে এডুইন লিঙ্ক বললেন, 'হয়তো কোনো স্পেনের জাহাজ কিম্বা স্পেনের কোনো উপনিবেশ থেকে এটা লুঠ করে নিয়ে এসেছিল ইংরেজ জলদস্যুর দল। অথবা কলম্বাস যখন এদিকে এসেছিলেন, তারই কোনো জাহাজের কামান হয়তো এটা জলে পড়ে গিয়েছিল।

সমুদ্রের তলায় আরেকটা জাহাজ দেখতে পেয়ে অভিযাত্রীরা আনন্দে ফেটে পড়লেন। তবে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে বোঝা গেল, সেটার বয়স বেশি নয়। বছর পঞ্চাশেক আগে ডোবা জাহাজের অংশ।

তবে যে জিনিসটি পেয়ে অভিযাত্রীরা সব থেকে খুশি হলেন, তা হলো একটি পেতলের পকেট ঘড়ি। ভূমিকম্পের সঠিক সময় বুঝে উঠতে পরে ঘড়িটা খুবই সাহায্য করেছিল।

অভিযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে প্রায়ই হাসি-ঠাট্টা করতেন, যদি জলের তলায় পুরনো দিনের সোনা-দানা মণি-মুক্তো পাওয়া যায়। একদিন সকালে এয়ার লিফ্‌টের মুখ থেকে জল আর নুড়ি বালির সঙ্গে বজরার ডেকে ঠিকরে পড়ল চক্‌চকে একটা কি জিনিস। ডুবুরী অ্যাল-বানস্কি

তখন নুড়ি বালি সরিয়ে সরিয়ে দেখে নিলেন কিছু পাওয়া যায় কিনা। অ্যালরানস্কি চক্‌চকে জিনিসটি তুলি নিয়ে এড্‌ইনের স্ত্রী ম্যারিয়াম লিংককে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে যদি একটা সোনার ঘড়ি দিই, তো কেমন হয় ?

অবাক ম্যারিয়াম জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখলেন সত্যিই একটা সোনার মতো চকচকে ঘড়ি। সামনেটা প্রবালের পুরু আস্তরণে ঢাকা, পেছনে শৌখীন নক্‌শার আভাস।

ম্যারিয়ামের ইঞ্জিনঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন এড্‌ইন। ঘড়িটা হাতে পেয়ে তাঁরও উত্তেজনা উঠল চরমে। এড্‌ইন একবার ভাবলেন, এ ঘড়ি ভূমিকম্পের সময়কার জিনিস, পরে ভাবলেন, হয়তো পরে কোনো সময় কোনো জাহাজী যাত্রীর হাত থেকে পড়ে যাওয়া ঘড়ি।

সারা দুপুর বসে বসে খুব সাবধানে ঘড়ির পেছনটা পরিষ্কার করলেন এড্‌ইন। ঘড়ির কেসে ঘড়ি নির্মাতার নাম ফুটে উঠল: 'পল বন্ডেল।' খুশি হলেন এড্‌ইন। যাক্ ঘড়ি নির্মাতার এই নামটা নিশ্চই কাজে লাগবে, কোন সময়ের ঘড়ি এটা বুঝতে। ঘড়ির পিছনের ঢাকা খুলতেই এড্‌ইনের হাতের ওপর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল ঘড়ির ভেতরের ছোট্ট ছোট্ট পিতলের অংশগুলো। সামনের দিকটা যত্নে পরিষ্কার করলেন এড্‌ইন। না, ডালার ওপর কাচ নেই। দেখা গেল রুপোর মত চকচকে ছোট ছোট রোমান সংখ্যা, কিন্তু ঘড়ির ছোট বড় দুটি কাঁটারই চিহ্ন মাত্র নেই। তিনি ভাবলেন এক্সরে করে দেখলে হয়তো

ছবি □ হীরেন

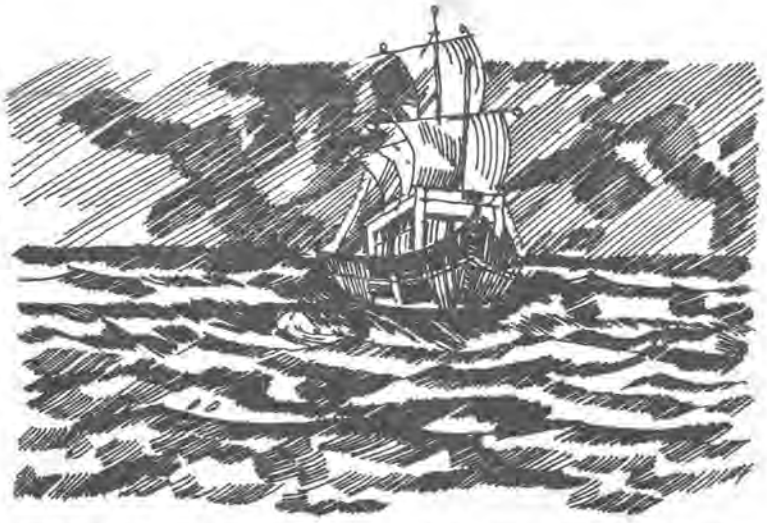

কাঁটার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরেরদিনই কিংসটনের এক দাঁতের ডাক্তারবাবু খুব যত্ন করে ঘড়ির ডায়ালের এক্সরে করে দিলেন। নেগেটিভ্ আলোয় তুলে এড্‌ইন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। নেগেটিভে ঘড়ির কাঁটার অবস্থার দাগ দেখা যাচ্ছে। বারোটা বাজতে সতেরো মিনিট বাকি। ভূমিকম্পের সঠিক সময়ের সংগে মিলে যাচ্ছে।

এ সময় লন্ডনের বিখ্যাত সায়েন্স মিউজিয়ামে খবর নিয়ে জানা গেল, 'পল বন্ডেল' ছিলেন আমস্টারডামের এক উদ্বাস্তু ঘড়ি শিল্পী। ষোলোশো ছিয়াশির পর তিনি আর কোনো ঘড়ি তৈরি করেনি।

ঝড়-জলের দিন এগিয়ে আসছে দেখে এড্‌ইন অভিযানের কাজ বন্ধ করে দিতে চাইলেন। দশ সপ্তাহ ধরে তলিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া শহর পোর্ট রয়্যালের অনেক খোঁজ-খবরই নেওয়া হয়েছে। ডুবুরীরা জল থেকে তুলে এনেছেন সেই সময়ের হঠাৎ থেমে যাওয়া জীবনের ছোট বড় বহু স্মৃতি। এর অনেক কিছুই রাখার ব্যবস্থা হলো জ্যামাইকার ইন্‌স্টিটিউটে। এড্‌ইন অভিযানের সংগীদের অনেক ধন্যবাদ জানালেন। পোর্ট রয়্যালের অনেক খবরই তারা এনেছেন। তৈরী হয়েছে জলের নীচের পুরনো শহরের নিখুঁত ম্যাপ, তাতে দেখানো হয়েছে কোথায় কোন ধ্বংসাবশেষ, মাপা হয়েছে সব জায়গার গভীরতা। থেমে যাওয়া ঘড়ি জানিয়েছে ভূমিকম্পের সময়।

কত অসুবিধার মধ্যেই না অভিযাত্রীদের কাজ করতে হয়েছে জলের নীচে আবছা আলো আঁধারিতে, কিছুই ভালো করে দেখা যায় না। হাংগর আর অন্য হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীর ভয়, নানাধরনের বিষাক্ত মাছ আর বিষাক্ত সামুদ্রিক পোকার কামড়ের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। ভাঙা দেওয়াল থেকে বোতল তুলতে গেলে সড়সড় বেরিয়ে এসেছে অক্টোপাস এবং আর কত শত বিপদ।

কেবল মাত্র খুঁজে পাবার উত্তেজনায় অস্থির হয়ে, আনন্দে মেতে উঠে নীল সাগরের জল তোলপাড় করে দিলেন কৌতূহলী ডুবুরীর দল, অনেক পরিশ্রমের শেষে হারানো শহর পোর্ট রয়্যালকে খুঁজে পেয়েছিলেন অভিযাত্রীরা।

চ্যাপলিন চার্লি

শমীন্দ্র ভৌমিক

হাসিতেই হৈ-চৈ হাসিতেই ফূর্তি
দেখলেই পর্দায় হাসিখুশি জুড়তি,
কেউ হাসে ফিক্ ফিক্ কেউ হাসে আস্তে
হাসির আসর থেকে পারে কেউ বাঁচতে?
তার সে কি হন্টন যেন ছোটা রকেটে
এই হাতে লাঠি আর ঐ হাত পকেটে।
গোঁফজোড়া দেখেছিস, কী ভীষণ দুষ্টু
হ্যাটখানি বেশ তার হৃষ্ট ও পুষ্টু।
বলতে পারিস কে? কোনখানে দেশ তার
আরো বলে দিই শোন শাদা-মাটা বেশ তার,
এ সবের উত্তরে কত বাত ঝাড়লি
লন্ডন বাসী তিনি চ্যাপলিন চার্লি।

সেদিনের সেই ছেলেটা

প্রবোধকুমার সান্যাল

দুই

সে বছর রাজা আসছেন রাজধানী কলকাতায়, সঙ্গে থাকছেন রানী মেরী। দিল্লীতে দরবার হবে, কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে যাবে দিল্লীতে। কলকাতার চারদিকে মস্ত হৈ-চৈ! গড়ের মাঠে বাজি পোড়ানো হবে।

তখন ইলেক্‌ট্রিক চালু হয়নি। সন্ধ্যে হলেই পথে-ঘাটে গ্যাসের আলো জ্বলে। সরু সরু গলিতে জ্বলে মিটমিটে তেলের আলো। যতদূরে, যে কোনোও দিকে তাকাও--হাজার হাজার খোলার চালার বস্তি।

নরেনদাদা বলল, 'না, এখন পড়াশুনো থাক্। দেখছিস নে পাড়ায় পাড়ায় সাজ সাজ রব। রাজা আসছেন যে! ঠনঠনে, মেছোবাজার, বারশিমুলে, হোগলকুঁড়ে, বাদুড়বাগান, নেবুবাগান, পটলডাঙা--চারদিকে সব সাজাচ্ছে। কাল দেখলুম ডি. এল. রায় ওঁর বাগানবাড়ি সাজাবার ফরমাস দিচ্ছেন। নন্দ চৌধুরীরা মেতে উঠেছেন। আমরাও বাড়ি সাজাবো রঙীন কাগজের শেকল বানিয়ে। তুই কি পারবি আমার সঙ্গে কাজ করতে?

আহ্লাদে নেচে উঠল সেদিনের সেই ছেলেটা:'খুব পারব। দেখো না আমাকে কাজ দিয়ে।'

দাদা কাজ দিচ্ছে, ছেলেটা ধন্য হচ্ছে। নাওয়া-খাওয়া সব বাজে কাজ। গুলি খেলা বন্ধ। ময়দার লেই তৈরি হচ্ছে। চার রকম রং-এর কাগজ এলো। পাট করে সেই কাগজ ছুরি দিয়ে কাটতে হচ্ছে। রংবাহার

কাগজের শেকল তৈরি করা কি সোজা কথা? ওতেই দু-দিন দু-বেলা চলে গেল। এর পর এলো মোটা কাগজের ছোট্ট একটা ফানুস। ওটা বাজার থেকে দাদা কিনে আনলো। কী সুন্দর ছবি আঁকা ওর গায়ে! ওটা ঝুলবে বাড়ির সামনের দরজায়। রাস্তার লোকের *তাক লেগে যাবে। রঙীন ক্যাগজের শেকল* দিয়ে বাইরের দেয়াল সাজানো হবে।

'দাদা?'

'কি বল্?'

'রাজা এসে দাঁড়াবে তো আমাদের বাড়ির সামনে? দেখবে সব?'

'হ্যাঁ, যদি এই গলি দিয়ে রাজা যায়, দেখবে বৈকি।'

ছেলেটা বলল, 'রাজা কি পাল্কি চড়ে আসবে? ওই যে এই গলি দিয়ে পাল্কি যায়–ধেই-কি-নাগড়, ধেই-কি-নাগড়, বাঁয়ে-সমাড়ো, ধেই-কি-নাগড় অমনি করে?'

দাদা বলল, 'দূর পাগলা, রাজা আসবে ল্যান্ডোয়... ষোল ঘোড়ার গাড়ি... রাজা রানী বসবে পাশাপাশি–বড় বড় ঘোড়া, ওয়েলার হর্স... সামনে পেছনে তিন হাজার লাল পাগড়ি পরা ঘোড়-সওয়ার।'

খোকা বলল, 'সেই যে মোহনবাগান এবার শীল্ড পেলো, সেই হাজার হাজার লোকের আমোদ-আহ্লাদ–সেই রকম?'

দাদা কাজ করতে করতে বলল, 'দূর বোকা। সে তো সব দেশী লোক, এ হলো রাজা, সম্রাট পঞ্চম জর্জ, রানী মেরী। এরা সবাই ইংরেজ।'

দাদা ওকে বোঝাতে লাগল, 'ওরা হলো ইংরেজ। জাহাজে চড়ে সমুদ্র পেরিয়ে ওরা আসে। ওদের দেশ হলো বিলেত।'

ছেলেটা বলল, 'কলকাতায় কেন আসছে?'

'বাঃ এটা যে ওদের রাজত্ব! ওরাই তো আমাদের মনিব।'

রাজা এলো একদিন, আবার চলেও গেল। মদন মিত্রের গলিতে যে এত সাজ সজ্জা,–কেউ ফিরেও দেখল না। খোকার উৎসাহ নিবে গেল। এর চেয়ে সেই মোহনবাগানের সমারোহ অনেক ভালো ছিল। সেই সেদিনের লক্ষ কন্ঠের চিৎকার হিপ-হিপ হুররে এখনো কানে বাজছে।

এ পাড়ায় এসেছে একখানা দু'চাকার গাড়ি, একটা লোক ঠেলে-ঠেলে সেই গাড়িটা আনছে। গাড়ির ওপর মস্ত এক টিনের বাক্স বাঁধা। ওই বাক্সের মধ্যে রয়েছে একটা কাঠকয়লার উনুন, তার ওপর কলাইয়ের হাঁড়িতে জল ফুটছে। সেই ফুটন্ত জল নিয়ে লোকটা তার মধ্যে কালো কালো এক রকম পাতা ফেলে দিচ্ছে, আর জলটা হয়ে উঠছে কালো বর্ণ। তাইতে দুধ আর চিনি গুলে দিয়ে লোকটা ছোট কলাইয়ের গেলাসে ঢেলে পাড়ার ছেলেদের খেতে দিচ্ছে। খোকা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কলাইয়ের গেলাসে তাকেও দিল। এর নাম চা,চা-কোম্পানি এইভাবে কলকাতায় চায়ের চলন করছে।

নানা বয়সের বহু লোক চারদিকে ভিড় করল। বিনা পয়সায় সবাই খেয়ে নিচ্ছে সেই চা। গরম জলে সেই পাতা, দুধ আর চিনি। সেই চিনি গংগাবর্ণ, নাম জাভার চিনি। সন্দেশের মতো তার সুগন্ধ। এক পয়সার প্রায় আধপোয়া, আবার ফাউও দিয়ে দেয়।

ওই চা-ওয়ালা সবাইকে চা খাইয়ে আবার ওই সংগে এক-এক মোড়ক চা উপহার দিয়ে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলে গেল। মা সেই মোড়কটি ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বেঁধে ভাঁড়ারের একটা মেটে হাঁড়িতে তুলে রাখলো। কারও সর্দি-কাশি, জ্বরভাব, গা ব্যথা হ'লে সেই চা জলে ফুটিয়ে আদার রস, তেজপাতা, মিছরি–এই সব মিলিয়ে রোগীকে খেতে দিত। তখন বাজারে কোথাও চা পাওয়া যেত না, চায়ের হোটেল কেউ ভাবতেও পারে না। ময়রার দোকানে বসে অনেকে শুধু খাবার খেয়ে যেতো। ডিম খাবার রেওয়াজ তখনও অতটা হয়নি।চপ, কাটলেট, কারি-কোর্মা–এদের নামও কেউ শোনেনি। বড়া, চাপড়ি, মাংস, পোলাও, *কালিয়া, এগুলো লোকেদের বাড়িতে হতো। পেঁয়াজ* আমরা লুকিয়ে খেতুম। বিলাতি বেগুন, যার নাম টমাটো–এগুলো বামুন বাড়িতে ঢুকত না। জ্বরের পথ্য হিসাবে এক পয়সা দামের একখানা বড় পাঁউরুটি–যার চেহারা ছিল নৌকোর মতো, সেখানা দুধে ভিজিয়ে রোগী খেতো। টোস্ট কাকে বলে কেউ জানত না। সকালের খাবার ডিম-মাখন-টোস্ট-এসব ছিল অভাবনীয়।শীতের দিনে ভাই-বোনের সংগে মিলে ওই ছেলেটা রঙীন ফুলকাটা দোলাই গায়ে জড়িয়ে মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা খেত।এক পয়সার মুড়ি কিনলে তিন জনের পেট ভরে যেত।

একদিন মামা নিয়ে গেলেন স্কটিশ চার্চ ইস্কুলে। যতদূর মনে পড়ে সেটা জানুয়ারী ১৯১২ সাল। মন্মথমোহন বসু তখন হেডমাস্টার। সেইদিন ছেলেটা

ভর্তি হ'লো। সব চেয়ে নীচু ক্লাসে, অর্থাৎ ৯বি ক্লাসে। ছেলেটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। বেঞ্চিতে বসা, সামনের টেবিলে ও ডেস্কে বই রাখা। এ যেন এক নতুন জগৎ। এ আর তোমার সেই চালতা বাগানের রঘুপন্ডিতের পাঠশালা নয়। এ হলো ইংরেজি স্কুল। ট্রামরাস্তার ধারে বিরাট নতুন তেতলা বাড়ি, চারদিক ফাঁকা। নীচের তলার সামনে আর পশ্চিমে ছুটাছুটি করার মাঠ। চাকরগুলো সব খাকি পোশাক পরা। উত্তর দিকে যেটা ঘন্টা বাজাবার স্ট্যান্ড, সেখানে ঘোরাফেরা করে দারোয়ান। এই পাট্টা জোয়ান! রঘুপন্ডিতের মতন তারও এক জোড়া গোঁফ। খাকি পোশাক মাথায় পাগড়ি পিছন দিকে ঝোলানো। লোকটাকে দেখলে ভয় করে।

এতদিন পরে ছেলেটার পায়ে উঠেছে চক্‌চকে ফিতে বাঁধা জুতো। গেঞ্জির ওপর উঠেছে ফুলহাতা টুইল শার্ট। এবার থেকে আর স্লেট-পেন্‌সিল, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ নয়। এখন ইংরেজি ফার্স্ট বুক, ইংরেজি কপিবুক খাতা আর উড-পেন্‌সিল। জামা-জুতো, নতুন পোশাক, বইখাতা, পেন্সিল—সব মিলিয়ে পড়েছে প্রায় চার টাকা। এখানে মন্মথবাবুর দয়ায় মাইনে-পত্র লাগছে না। এটা মিশনারিদের ইস্কুল। এত বড় ইস্কুল নাকি কলকাতায় নেই। ঠিক সাড়ে দশটায় ওই দারোয়ান যখন ঢং করে ঘন্টা বাজায়, সেই মুহূর্তে সব চুপ। কেউ শব্দ করবে না, পা ঘষবেনা, পাশের ছেলের কানে ফিসফিস করবেনা। মাস্টার-মশাই বেত হাতে নিয়ে ঢুকলেই সবাইকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রম জানাতে হতো। মাস্টারমশাই সকলের সোজা হয়ে দাঁড়াবার ভংগী দেখে একসময়ে বলতেন, 'সিটডাউন!' সবাই বসে পড়তো।

৯বি ক্লাসে মোট বত্রিশ জন ছেলে। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। সামনে মস্ত কালো বোর্ড স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করানো। এই ক্লাসের ছেলেরা সবাই এ বছরে নতুন ভর্তি হয়েছে। এটা মস্ত বড় হলঘর। ওদিকটায় ৯ এ ক্লাস। মাস্টারমশাই বোর্ডে তিন লাইন বাংলা লিখলেন। ছেলেরা তাই দেখে-দেখে নিজেদের খাতায় লিখতে লাগল। এর পর এ-বি-সি-ডি দেখে-দেখে লেখা, তারপর ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর করে টেন্ পর্যন্ত।

ওইটুকু ছেলের পক্ষে এত কাজ একদিনে কি সম্ভব? টিফিনের আগে ছেলেটা হিমসিম খেয়ে গেল। ইস্কুল চারদিক থেকে বন্ধ, উঠোনের চারদিকে কড়া পাহারা। কারো পক্ষে কোনো দিক দিয়ে পালাবার উপায় নেই।

বেলা চারটের সময় ছুটি। নীচেতলায় মাস্টাররা বেত হাতে নিয়ে লম্বা সারিতে আগে দাঁড়াবেন। প্রথম ব্যাচে বেরোবে ছোট ছেলেরা সারবেঁধে এক লাইনে। একটি কথা কেউ বলবেনা, লাইন ভাঙবেনা, একজনকে টপকিয়ে অন্যজন যাবেনা। যদি যাবার চেষ্টা করে তাহলে পড়াং করে পায়ের ওপর এক ঘা বেত! বেত ছাড়া মাস্টার নেই। বেত ছাড়া নাকি ছেলে মানুষ হয়না।

রায়বাগান স্ট্রীট দিয়ে ছুটির পর বাড়ি ফিরতে হতো। ট্রামরাস্তার গাড়িঘোড়া এ দিকে নেই। এগলি ওগলি পেরিয়ে এলে সামনেই হেদোর ধার। বিডন স্ট্রীট পার হয়ে হেদোর ফুটপাথ ধরে মানিকতলা স্ট্রীটে এলে সামনেই মদন মিত্রের লেন। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণে। দাদারা আমাকে একলা ছাড়তো না। এটা মায়ের নির্দেশ। পাঠশালার কালে স্বাধীন ছিলুম।

এবার থেকে কড়া নিয়ম আর কঠিন শাসন। সবাই এখন বলছে, ওকে বাগ মানাতে গেলে সাহেবদের ইস্কুলই দরকার।

কোথায় গেল পাঠশালার সেই সুর ক'রে নামতা পড়া! এখানে অন্য রকম। এটা খ্রিশ্চান স্কুল। এটা মিশনারী বিদ্যালয়। ক্লাস আরম্ভ হবার ঠিক আগে একটি ছেলে ধুয়ো ধরে, "প্রভু যীশু নাম অশেষ গুণধাম, প্রণিপাত করি তব চরণে–" অন্য সব ছেলেরা একই সুরে সেটি আবৃত্তি করে।

ইংরেজিটা কিছুতেই রপ্ত হয়না। ওটা সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। তবু ওটা তৈরি করাই চাই। অন্যগুলো অত কঠিন নয়। হাতের লেখা, বাংলা পড়া, বাংলা বানান মুখস্থ–এগুলো এক রকম তৈরী হয়। হ'তে চায়না ফার্স্ট বুক। আগে দু অক্ষরে পরে তিন অক্ষরে। তারপর সব জন্তু-জানোয়ারের ইংরেজি প্রতিশব্দ।

এই সব করতেই এক বছর গেল। এবারে উঠলুম ওইদিকের ক্লাসে, যেটা ৯এ। প্রথম মাসেই পাওয়া গেল কয়েকজন বন্ধু–তাদের কারো নাম আল্তাবুদ্দিন, কেউ পার্শী–গজদার আহমেদ, কেউ ভুটানী বৌদ্ধ–বুধ সিং। কেউ বিহারী, কেউ অসমিয়া, কেউ বা বোষ্টম। এখানে একটা বিষয় এলো, সেটা ছোটদের বাইবেল। ওই বাইবেল মুখস্থ করা চাই পরীক্ষার আগে। আমি মনোযোগ দিয়ে প্রাণপণে লেখাপড়া করছিলুম। এই বছরেই কয়েকটা ঘটনা ঘটে। পাশের বাড়ির বড় ছেলে খোকা মিত্তিরের খুব ঘটা করে বিয়ে হয়। তাই দেখে দিদিমার টনক নড়ে। তাঁর একটিমাত্র নাতি নরেনদাদা এখন চাকরি করে এবং চোদ্দ টাকা মাইনে পায়। সুতরাং তারও বিয়ে হওয়া দরকার। পাত্রী ঠিক হলো, মেয়ের বাবা হলো একজন ব্যবসায়ী। সুতরাং নগদ তিনশ টাকা, গয়না গাঁটি, বরাভরণ, দান-সামগ্রী, ফুলশয্যে, গায়ে-হলুদ–সব মিলিয়ে মস্ত ঘটা। চতুর্দোলায় বর যাবে, আমি হবো নিতবর, চামর ঢোলাবে দুদিক থেকে দুটো বাচ্চা মেয়ে, ষোলজন লোক সেই চতুর্দোলা কাঁধে তুলে নিয়ে যাবে কন্যাপক্ষের বাড়ি। সঙ্গে যাবে ব্যান্ড বাদ্য, মদ্রাজী ফ্লুট, পঞ্চাশজন আলো নিয়ে যাবে। ওদেরই মাঝখানে দিয়ে চলবে পুতুল-নাচ, কাগজের হাতী, রাক্ষসী, উট, বরকন্দাজরা নেবে ব্যাগপাইপ–প্রায় এক মাইল লম্বা মিছিল। বরকর্তারা, নাপিত, পুরোহিত, বরযাত্রীর দল–সব যাবে সঙ্গে। আতর, চুয়াচন্দন, গোলাপজল, যুঁইফুলের মালা, মখমলের পোশাক পরা আঁটাসোঁটা হাতে প্রহরী–সে এক বিরাট শোভাযাত্রা। প্রায় তিন হাজার পাত পড়বে। আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে যাবে চারদিক। মামা দিদিমা–এঁরা সবাই হিসেব পত্র-নিয়ে বসলেন।

প্যারীস্যাকরা এলো মানিকতলা থেকে। বলল, খাঁটি গিনিসোনার ভরি ষোলটাকার কম হবেনা। নতুন বৌকে অন্তত পনেরো ভরির জিনিস দিতে হবে বৈকি। পায়ে রূপোর মল, পাঁয়জোর, চুটকি, নাকে নথ চেনটানা, কানে মাকড়ি, হাতের কনুইতে তাগা, কোমরে সোনার চন্দ্রহার ওরা দিচ্ছে।

আমি একমনে আগাগোড়া সব শুনছিলুম।

মোহিতদা বলল, 'পাইকারি দরে চিনিপাতা দই এখন দশটাকা মণ। এখনতো বিয়ের লগ্নসা। রুই মাছ অন্তত বারো টাকা মণ, গাওয়া ঘিয়ের দর চড়া, অন্তত পঁয়ত্রিশ টাকা মণ, ময়দার দর তিন টাকা, ভালো চালের দর প্রায় ওই একই–আড়াই টাকা থেকে তিনটাকা মণ। সাচ্চা জরির কাজ,সোনার সুতো দিয়ে তৈরি একখানা বেনারসীর দাম অন্তত তিরিশ টাকা। সেদিন কি আর আছে নাকি?'

দাদার বিয়ে হয়ে গেল। বাড়িতে এলো নতুন বৌদিদি।

দ্বিতীয় ঘটনা, আমাদের কাশীর মেসোমশাই–যিনি মাঝে মাঝে আমাদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতেন,তিনি এ বছর রায়বাহাদুর উপাধি পেলেন। তৃতীয় ঘটনা আমাদের পাড়া থেকে একটু পশ্চিমে, যেদিকে কাঁসারি পাড়ার ভিতর দিয়ে সিঙ্গিবাগান আর চোরবাগান ছাড়ালে চাষা-ধোপাপাড়া, তারই ভিতর দিয়ে গেলে ওই পিরিলি বামুনদের ঠাকুরবাড়ি, সেই বাড়ির রবি ঠাকুর এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পাড়ায় পাড়ায় এই নিয়ে খুব হৈ-চৈ চলছে। আবার ঠিক এই বছরেই মারা গেলেন নাট্যকার গিরীশ ঘোষ।

আমি খুব খারাপ ছিলুম না লেখাপড়ায়। যা কিছু জিজ্ঞেস করত গড় গড় ক'রে মুখস্থ বলে যেতুম। পদ্য মুখস্থ করা অভ্যাস ছিল, গদ্যও অনর্গল বলতুম। ফার্স্ট বুক অত কঠিন, কিন্তু ছয় মাসেই টনটনে। অঙ্ক দিলে বেশ কষে দিতুম,কিন্তু বুদ্ধির অঙ্কে একটু কাঁচা ছিলুম। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, এগুলো সোজা। এ নিয়ে বেতের বাড়ি খাবার জন্য হাত পাততেও হতো না। এমনি করেই তো ৯এ শেষ হয়ে এলো। কিন্তু বাড়িতে না জানিয়ে পালিয়ে যাওয়া, ওটা ছিলই। যুগীপাড়া, গড়পার, বাদুড়বাগান–এ সব চেনা হয়ে গেল। দর্জিপাড়া, শ্যামপুকুর, সিকদার বাগান,

উল্টোডিঙি–এখন সব চেনা। শুড়িপাড়া হরতকি বাগান–যখন তখন। এখন ডাফ চার্চে নতুন বন্ধু পেয়েছি। তার নাম সিমি। সে খ্রিশ্চান। তার সঙ্গে পাওয়া গেছে ডাফ স্ট্রীটের পাতুকে। পাতুও খ্রিশ্চান। প্রতি রবিবার সকালে ওদের ডাফ চার্চের বাঙলোয় গেলে বিস্কুট, কেক আর লজেন্স জোটে।

এবার ৮এ ক্লাসে উঠেছি। ভালো নম্বর পেয়েছি, সবাই খুশী। ব্রজপতিবাবু বুড়ো, অঙ্কের মাস্টার। ক্লাসে বসে গল্পগুজব করলে কেউ কিছু বলেনা। কিন্তু ক্যামেরন সাহেব কিম্বা ম্যাকলিন সাহেব যখন ক্লাস দেখতে আসে, তখন সবাই পাথরের মতন চুপ, টুঁ শব্দটি নেই। মাঝে মাঝে আসেন মন্মথবাবু, কিন্তু তিনি শীঘ্রই অবসর নেবেন। দেখতে দেখতে গরম কাল এসে গেল। আগে ছিল টানা পাখা। দেয়ালে ফুটো ক'রে বাইরে থেকে চাকরেরা দড়ি টানতো, আর ভিতরে মস্ত শতরঞ্চির মতো মোটা কাপড়ের বাতাস বইতো। এখন সেখানে এলো ইলেকট্রিক পাখা। সুইচ টিপে দিলে বোঁ বোঁ করে ঘোরে। ছেলেরা অবাক হয়ে উপর দিকে চেয়ে থাকতো।

একটা বাচ্চা নেড়ি কুকুর পুষেছিলুম। তাকে জল ও খাবার দিয়ে তেতলার ছাদে রেখে দিতুম। আমাদের হাতে একটু আদর পেলেই সে গলে যেতো। কাঠের একটা বাক্স কাত করে তার শোবার ব্যবস্থা করেছিলুম। তাকে ডাকতুম 'শুয়ার' বলে। সে আমার খাবারের ভাগ পেতো, এবং শুয়ার বলে ডাকলে সে কৃতার্থ হয়ে আমার কোলের উপরে চড়ে বসতো।

একদিন একটু বেশি আদর করতে গিয়ে সে পায়ে কামড়ে দিল এবং রক্ত বেরোলো। তৎক্ষণাৎ গিয়ে দিদিমাকে জানালুম। তিনি শিউরে উঠে বললেন, সর্বনাশ, নেড়িকুকুর কামড়ালে দশদিনের মধ্যে যে পাগল হয় ভাই। শিগগির চল্ ওই গাছ-গাছড়ার দোকানে। ওরা বেদের গুষ্ঠি, এখনই ঝাড়ফুঁক করে দেবে। চল্ এখুনি যাবো।

বড়রাস্তায় সেই বেদের দোকান সব বলতেই, তারা একটা জড়িবুটি বার করলো। তারপর একখানা মাটির সরা আমার পায়ের কাছ রেখে বলল, 'এই শেকড় হাতে নিয়ে ওই সরায় পা রেখে ঘোরো। সরা যদি ভাঙে তবেই বুঝবে বিষ ঢুকেছে শরীরে। তখন গোঁদলপাড়ায় যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবেনা।'

সরায় পা রেখে একটু ঘুরতেই মড়্মড় ক'রে সরাটা ভেঙে গেল।

দিদিমা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ত্রাহি মধুসূদন, বিধবার সন্তানকে রক্ষে করো হে মা দুর্গা...। চল্ ভাই কাল ভোরেই যাবো গোঁদলপাড়ায়–।'

পরদিন ভোরে শিয়ালদা স্টেশনে এসে দিদিমা আমাকে নিয়ে রেলগাড়িতে উঠলেন। এপথ আমাদের চেনা। নৈহাটিতে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে আমি কয়েকবারই চুঁচড়ো আনাগোনা করেছি। ওখানে আমার এক মাসির বাড়ি। এবারে কাঁকিনাড়ায় এসে নামলুম। কুকুরের বিষ শরীরে কতটা আছে জানিনে, তবে বড়ই আনন্দ পাচ্ছিলুম নৌকোয় উঠে। গঙ্গা যেন ঢেউ খেলিয়ে আমার এই অভিযানকে সার্থক করে

তুলেছিল। কুকুরের কামড় বড় সৌভাগ্যের। ওপারে এসে কতক্ষণ হেঁটে গোঁদলপাড়ার এক মস্ত জরাজীর্ণ বাগান বাড়িতে এসে পৌছলুম। এপাশে ওপাশে বাগান, ক্ষেত-খামার, মস্ত পুকুর, গাছপালা আর ফলফুল। অনেকেই এখানে ওষুধের জন্য আসে। একজন মেয়েছেলে চুল এলিয়ে এসে দিদিমার মুখে সব শুনলো। পরে বলল, 'হ্যাঁ, আমাকেই এলোচুলে ওষুধ বাটতে হবে। বসুন আপনারা। ওষুধের শেকড় বার ক'রে আনি।'

মেয়েছেলেটি গিয়ে কি যেন পাতা ও একটি শিকড় এনে শিলনোড়া নিয়ে বাটতে বসে গেল। দিদিমা ভয়ে ও ভাবনায় আড়ষ্ট, মনে মনে দুর্গানাম জপ করছিলেন।

এরপর ওই মেয়েছেলে একটি পিতলের বাটিতে ওই ওষুধটি জলে গুলে আমাকে সবটাই খেতে বলল। একটু বুনো গন্ধ, কিন্তু খেতে মন্দ নয়। তারপর বলল, 'ওই সামনের পুকুরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এই বাটি ধুয়ে আনোগে। আমার ছেলে যাবে সঙ্গে।'

তারপর দিদিমার দিকে ফিরে বলল, 'এই বাটি ধুতে গিয়ে যদি জল দেখে পুকুরে ঝাঁপ দেয়, তবে শিবের অসাধ্য!'

'অ্যাঁ–' দিদিমা আঁতকে উঠলেন।–'তাহলে কি হবে মা?'

'কোনও উপায় নেই। এ ওষুধ বড্ড কড়া। ভগবানকে ডাকুন–'

বাটিটা নিয়ে আমি গদাই লস্করি চালে যখন পুকুর ঘাটের দিকে যাচ্ছিলুম, তখন সঙ্গের লোকটা জানতে চাইল, আমি সাঁতার জানি কিনা–

'না'–এই বলে নির্দেশমতো ঘাটে নেমে সিঁড়িতে বসে বাটিটা বেশ করে ধুলুম। মুখে জল দিলুম। পুকুরের ওপারটা বেশ সুন্দর। গাছে কোথায় যেন কোকিল ডাকছে! আমি দিব্যি সুস্থ হয়ে বাটিটা নিয়ে ফিরে এলুম। এখানে, আর এক দন্ডও নয়। চলুন দিদিমা এবার যাই–

আমি একটা গাছের ছোট ডাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। একটা কিছু হাতে না থাকলে হাত নিশপিশ করে।

দিদিমা তাঁর পেট-কাপড় থেকে দুটি টাকা বার করে ওই মেয়েছেলেটার হাতে দিলেন। একটা টাকা পুজো, আর একটা টাকার ওষুধ।যাবার সময় আবার মেয়েছেলেটা বলে দিল, 'যে রাস্তায় আসা, সে-রাস্তায় যাওয়া চলবে না। ওতে ওষুধের ফল নষ্ট হয়। এই রাস্তা দিয়ে যাও–সোজা মানকুন্ডু ইস্টিশান।'

কী আনন্দ আমার মনে। আশে পাশে ঘন জঙ্গল, এখানে ওখানে বড় বড় পুকুর। আমরা কাঁচা রাস্তা ধরে চললুম। দু'পাশের গাছপালা থেকে কোকিল ডাকছে। কোথাও কোথাও পুকুরে হাঁসেরা সাঁতার দিচ্ছে। পথে লোকজন নেই। এ আমার পক্ষে নতুন। তখনও আমি পাড়াগাঁ বলতে বনহুগলী আর পালপাড়া বা দমদম–এই সব বুঝতাম। তখনকার দিনে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড যখন জনশূন্য থাকতো তখন মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সেই 'এমারেল্ড্ বাওয়ার' ছাড়িয়ে গেলে একেবারে দু-ধারে ঘন বন। আজ এই পথে দেখছি সেই বন, মাঝে মধ্যে পাতার ঘর।

'ও দিদিমা, সাপ...'

'সাপ! '–দিদিমা আঁতকিয়ে উঠলেন, 'কোথায় সাপ?'

'এই যে খানার ধারে!'

দুজনে দেখলুম প্রকান্ড লম্বা একাট কেউটে সাপ খানার ভিতর থেকে পথের উপরে এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ আমরা হনহনিয়ে পালাতে লাগলুম।

হাতের সেই ডালটা নিয়ে সপাং করে রাস্তায় মেরে একবার সাপটাকে ভয় দেখবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সাপটা একেবারেই ভয় পেলো না, বরং আরো দ্রুতগতিতে পথের উপর এগিয়ে আসছে।

তখন আমি দে ছুট্। দিদিমা অনেকটা এগিয়ে গেছেন।

মানকুন্ডু স্টেশনে এসে দিদিমা আর আমি দু-জনেই হাঁপাচ্ছিলাম। তারপর আমরা টিকিট করলুম। দুখানা টিকিট সাত আনা,–আমার হাফ-টিকিট। তখন একটাকায় চৌষট্টি পয়সা, একশ' আটাশটা আধলা এবং একশ' বিরানব্বইটা সিকি পয়সা। সিকি পয়সা বা পাই পয়সা কলকাতার দোকান বাজারে বিশেষ চলতো না। ওটা চলতো শুধু পোস্ট অফিসে কিংবা রেল-স্টেশনে। দিদিমার কাঠের বাক্সে অনেক সিকি পয়সা জমে যেত। আধলাটাই বাজারে বেশি চলতো। রেলের টিকিট কাটতে গিয়ে সাত আনা থেকে দুটো সিকি পয়সা দিদিমার হাতে ফেরত এলো। ওর ওপর আরেকটা পয়সা দিয়ে দিদিমা আমাকে দুখানা ঘিয়ে ভাজা কচুরি আর আলুর দম কিনে খাওয়ালেন। তারপর রেলগাড়ি এলো। আমরা হাওড়ার দিকে

রওনা হলুম।

সেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি করে ভটচার্যি বাগানে ফিরতে ছয় আনা ভাড়া লেগেছিল।

ছোটবেলায় আমাকে দোকান থেকে সব জিনিস কিনে আনতে হতো। ওটা ছিল লালাদের দোকান। দোকানির নাম ছিল চিরঞ্জীলালা। আমাদের বাড়ির ঠিক পাশে খোলার চালাঘর, তারই উত্তর গায়ে লালার দোকান। লংকা-হলুদ-ধনে জিরা-মরিচ সব মিলিয়ে এক পয়সা, এক পোয়া খাঁটি সরষের তেল তিন পয়সা, ঘানির তেল চার পয়সা, দু-পয়সার মট্‌কির ঘি, এক পয়সার এক ঠোঙা পোস্ত, আধসের আলু দু'পয়সা, ছয় গন্ডা বাতাসা–এক পয়সা, জাভার ছিনি আধ পোয়া–দু-পয়সা, আধসের মুসুর বা ছোলার ডাল দু-পয়সা, ভালো ময়দার সের পাঁচ পয়সা, একসের আটা চার পয়সা। ভালো ঢেঁকিছাঁটা সিদ্ধ চাউল আড়াই টাকা মণ। পটল ডাঙার বাজারে গেলে আরেকটু কম দামে সব পাওয়া যেতো। খাঁটি গরুর দুধ তখন একটাকায় পাঁচ সের। শীতের বড় বড় কমলা নেবু এক টাকায় এক ঝুড়ি। গরমকালে দিদিমা পোস্তা থেকে মুটের মাথায় আম আনতেন–মধুর মতো মিষ্টি–আট আনায় একশ'।

এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছু গল্প, কিছু স্মৃতি.....

অ্যালিসের স্রষ্টা ল্যুইস ক্যারল

তোমরা নিশ্চয় অ্যালিসের গল্প পড়েছো আর মনে মনে একবার অ্যালিসের সংগে স্বপ্নের দেশে ঘুরে এসেছো। অ্যালিসের সুন্দর গল্পগুলো যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর নাম ল্যুইস ক্যারল। এটা অবশ্য পোশাকী নাম, আসল নাম, চার্লস ল্যুউইজ ডজসন। ১৮৩২ সালে আমেরিকার এক ছোটো শহরে তাঁর জন্ম। তিনি বরাবরই মেধাবী ছিলেন। অকস্‌ফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে ছাত্রজীবন শেষ করে ওই কলেজেই অধ্যাপনার কাজ নেন। সেখানে অংকের অতি জটিল পদ্ধতিগুলো খুব সহজ করে তুলে ছাত্রদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। শান্তশিষ্ট এই মাস্টারমশাই কিন্তু অত্যন্ত লাজুক ছিলেন, একা একা থাকাটাই পছন্দ করতেন। তবে সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সংগে গল্প করে সময় কাটাতে। ছোটদের ভালবাসতেন বলেই না তিনি ছোটদের মনের মতো গল্প

এত সুন্দর করে বলতে পারতেন।

গ্রীষ্মের এক ছুটির দিনে লিডেল পরিবারের ছোট্ট দুটি মেয়ের সংগে তিনি গেলেন নৌকো চড়ে চড়ুইভাতি করতে। সেইদিন বেড়াতে বেড়াতে তিনি যে সব গল্প বলেছিলেন, তারই সংকলন আমরা পেলাম ১৮৬৫ সালে 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার-ল্যান্ড'। বইটা প্রথমে নিজের হাতে লিখে এবং ছবি এঁকে তিনি সত্যিকারের অ্যালিসকে উপহার দেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবের উদ্যোগেই সেই বইটা শুধু ছোটদের নয় বড়দেরও ভীষণ ভালো লেগে যায়। এমন কি রানী ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত এমনই অভিভূত হন যে লেখক অংকশাস্ত্রবিদ-এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে লেখককে একখানা চিঠিও দেন।

এরপর সকলের অনুরোধে তিনি বইটিকে পরিমার্জিত এবং বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করেন "অ্যালিস'স অ্যাড-ভেন্‌চারস্ আন্ডারগ্রাউন্ড" নামে, এবারের ছবি গুলো আঁকেন জন ট্যানিয়েল। এই বইটির জনপ্রিয়তা লেখককে উদ্বুদ্ধ করে 'থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস' এবং 'ওয়াট অ্যালিস ফাউন্ড দেয়ার' লিখতে। পরের বই দুটোও আগের মতনই ছোট-দের মন জয় করে। এছাড়াও তিনি চার্লস নামে অংক এবং তর্কশাস্ত্রের ওপর দু'খানা মূল্যবান বই লেখেন। ১৮৯৮ সালে এই বিশ্ববরেণ্য লেখকের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

ঝুমুর কুশারী

গুণিন

নিখিলচন্দ্র সরকার

কলকাতার মার্কোপোলো ক্লাবের অনিন্দ্য সুজিত আর পলাশের অনেকদিনের স্বপ্ন সুন্দরবনকে বড় কাছ থেকে দেখবে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ওরা হাজির হলো সুন্দরবনের কাছে এক গ্রামে। এখন সুন্দরবনে যাওয়া যায় কিভাবে, সেই মতলব আঁটতে লাগল তিন জনে। চেষ্টা করতে করতে সুযোগও এসে গেল একদিন। ভাগ্যধরের নৌকায় সুন্দরবন দেখতে বেরিয়ে পড়ল কলকাতার তিনটি দামাল কিশোর। তারপর জলে-জঙ্গলে কি হলো, তা নিয়েই এর শেষ পর্ব।

ভাগ্যধর সেই কথারই জের টানে, 'আমাগর ত আর ক্ষেতি-জমিন নাই। মহাজনরাই বাপ-মা। বিপদের দিনে অরাই ধার কর্জ দেয়। নিজের নৌকো থাকলিও না হয় কথা ছেল।'

'এ নৌকো তাহলে তোমার নয়?' ওরা অবাক হলো।

'না বাবু। সজনিতলার বনমালী সাউয়ের নৌকো। ওই আমাদের মহাজন।'

গোবর্ধন দাঁড় টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দাঁড়টা জলের ওপর তুলে ধরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। হাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে বলল, 'বনের মধু, কাঠ আনতি পারলি তবে পেট চলে।'

'আপনারাই বলেন বাবু, এইভাবে বাঁচন যায়?' ভাগ্যধর ওদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ওরা জবাব খোঁজে, পায় না। কি জবাব দেবে এর! একটু চুপ করে থেমে সুজিত বলল, 'কেন, আরকিছু

করতে পার না?'

'ব্যবস্থা থাকলি কি আর কেউ ওই বিপদের মধ্যি যায়?' বলরাম দাঁড় টানতে টানতে বলে।

'গরীব মাইন্ষের ওই জঙ্গলই শেষ সম্বল। ওই জঙ্গলই আমাগরে বাঁচায়ে রাখিছে।' গোবর্ধন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আবার দাঁড় টানতে শুরু করে।

'জঙ্গলে ঢুকতে দেয়?' পলাশ তাকায় গোবর্ধনের দিকে।

'তা কি আর দেয় গো বাবু, লুকায়ে চুরায়ে যাতি হয়, ধরা পড়লি নৌকা আটক করে। আমাগও আস্তি দেয় না। পয়সা নিয়া তবে ছাড়ান দেয়।' গোবর্ধনের দৃষ্টি উদাস।

'তার উপরি আছে জঙ্গলের ভয়। কার যে কহন সব্বনাশ হয় কেউ জান্তি পারে না। এহানে মাইন্ষের দাম নাই, জঙ্গলের বড় মিঞার খাতির আছে।' ভাগ্যধর আরো কি সব ভাবে। তার মুখের চামড়া সংকুচিত হয়। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই ওদের জীবন কাটে। তাদের কথা আর কে শোনে। উপায় নেই বলেই তো ওরা জঙ্গলে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নৌকোর হাল ঘোরায়। নৌকো এবার দক্ষিণমুখো বাঁক নিল। ভাগ্যধর বলল, 'ওই দেহেন বাবু, গোসাবা আইসা গেলাম।'

ওরা দেখল, নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধ। অনেক দোকান-পাট। অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি নদী মাঝিদা?'

'বিদায়।' একটু থেমে ভাগ্যধর আবার বলে, 'এইবার আমরা গোসাবার পাশ দিয়া গিয়া দুর্গাদুয়ানী খালে পইড়ব। তারপর গুমর নদী।

উত্তরের দিকে আগায়ে গেলে ডাইনেই সজনে-খালি।'

'ওখানে কি আছে মাঝিদা?'

'কি আর, জঙ্গল? ওই জঙ্গলে অনেক পাখি দেইখ্তে পাবেন বাবু।'

নৌকো এবার গোসাবার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যধর বলল, 'ওই বাঁধের পিছনেই একটা গেরাম আছে, মালোপাড়া। লোকে এটারে বিধবা পাড়াও বলে, কেন জানেন বাবু?'

'না।' ওরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

ভাগ্যধরের চোখেমুখে বিষণ্ণতার ছায়া নামে। একটু সময় চুপ করে থেকে ও বলে, 'ওই মালোপাড়ার ঘরে ঘরেই বিধবা। ওরা মাছ ধইরতে জঙ্গল যায়। প্রচুর মাছ এই বাদার জলে। এক মাস দুই মাসও থাইক্তে হয়। মহাজনের ভেরীতে মাছ তুইলে দেয়। নৌকাতেই ঘরবাড়ি। জোয়ান মরদ যারা যায়, তারা সবাই আর ফিরা আসে না। ঘরে ঘরে কান্নার রোল পইড়ে যায়।'

ওই গাঁয়ের পাশ দিয়ে যেতে পলাশদের বুকের ভেতরটাও কেমন মোচড় দেয়। ওরা যেন চোখের সামনে একটা শোকের চেহারা দেখছে। বাঁধের ওপর একটা দুটো ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের মুখগুলো কী করুণ অসহায়। এই তাহলে সুন্দরবন? এরকম তো ধারণা ছিল না ওদের।

একটু পরে নৌকো একটা খালের মধ্যে পড়ল। গোবর্ধন বলল, 'এই দুর্গাদুয়ানী।'

দু পাশেই গ্রাম। যেতে যেতে ভাগ্যধর বলল, 'কদিন আগের ঘটনা, এই কাছাকাছি আমলামেথি গেরাম। এই গাঁয়েরই অনিল মন্ডল কাঠ আইন্তে বনে ঢুকছেল। ব্যস, আর ফিরল না।'

সামনেই গুমর নদী। জলের রঙ আরো ঘোলা। জলের দিকে তাকাতে বুকের ভেতরটা কিরকম করে। বেশ চওড়া আর গভীর। আস্তে আস্তে নৌকো ওপর উঠল। 'ওই দ্যাহেন বাবু জঙ্গল।'

ওরা এগিয়ে চলেছে। ঘন জঙ্গল। এই দিনের আলোতেও বেশী দূর দৃষ্টি যায় না। আশে পাশে আর কোন নৌকো বা লঞ্চ নেই। গা ছমছম করে।

এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ভাগ্যধর বলে, 'দ্যাহেন বাবু খুব ভাল কইরে দ্যাহেন। এই হল সুন্দরবনের জঙ্গল। ওরা দেখতে দেখতে যাচ্ছে। ডাইনে আরও অনেক ছোটবড় গাঙ খাল পুব মুখো হয়ে বেরিয়ে গেছে। দুপাশেই ঘন জঙ্গল। বলরাম বলল, 'এই গুলান গিয়া ওই পাশে মিশছে।'

ভাগ্যধর সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'জঙ্গলের ভিতরেও ওইরকম অনেক খাল-খাঁড়ি দেইখ্তে পাবেন। কোনটা ফুঁড়ন খাল, কোনটা সিস খাল।'

আরো খানিকটা এগোতেই গোবর্ধন আঙুল তুলেত দেখায়, 'ওই যে বাবু হেঁতালের ঝোপ দ্যাহেন।

অনিন্দ্য উৎসাহ বোধ করে, 'হেঁতাল, কোনগুলো হেঁতাল'?

পলাশরাও তাকিয়ে থাকে জঙ্গলের দিকে। এই নামটা ওদের জানা। চাঁদ সদাগরই তো হেঁতালের

লাঠি নিয়ে সারারাত লখিন্দরের বাসরঘর পাহারা দিয়েছিল। সাপ আসে না। ওরা দেখল অনেকটা নারকেল গাছের পাতার মতন ছড়িয়ে আছে। গাছগুলো খুব বড় নয়। রোদের আলোয় চিকচিক করছে।

ভাগ্যধর বলল, 'ওই ঝোপগুলানই বড় ভয়ের বাবু, ওর ভিতরে বড় মিঞা গা ঢাকা দেয়। বুইঝতেই পারবেন না কিছু।'

'শুধু কি তাই বাবু, বিষধর সাপেরও অভাব নাই।' বলরাম ওদের মুখের দিকে তাকায়।

পলাশ হালকা গলায় বলে ওঠে, 'এ যে দেখছি সব দিকেই বিপজ্জনক। জলে কুমীর, ডাঙগায় বাঘ !'

ভাগ্যধর হাঁ হাঁ করে উঠল, 'উহুঁ উহুঁ, জঙগলে আসি ওই নামও মুখে আইনবেন না বাবু !

পলাশ ভুলে গিয়েছিল। ও চুপ করে থাকল।

হঠাৎ ভাগ্যধরের মুখের চেহারা কিরকম বদলে গেল। কান খাড়া করে রাখল খানিকক্ষণ। কি একটা শোনার চেষ্টা করছে। মুখের ওপর অস্বস্তি। একটা ভয়। গোবর্ধনকে বলল, 'সরকারী লঞ্চ। সামনে পইড়লে আর রক্ষা নাই।'

'বাবু আপনারা কোন কথা কইবেন না।'

হঠাৎ নৌকোর গতি বেড়ে যায়। ভট্‌ভট্‌ একটা শব্দ এগিয়ে আসছে। সামনেই ছোট খাল। সেই খালে পড়ল নৌকো। শব্দ আরো কাছাকাছি চলে এসেছে। জোরে জোরে দাঁড় টানছে ওরা। কারও মুখে কোন কথা নেই। আর দেখা যাবে না ওদের। জঙগলের বাঁকে নৌকো লুকিয়ে রাখল খানিক্ষণ। গোবর্ধন, বলরাম ঘামছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। জঙগলের দিকেও ওরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। লঞ্চের শব্দ একটু একটু করে দূরে চলে যাচ্ছে। এক সময় তা একেবারেই মিলিয়ে গেল। খনিক পরে আবার নৌকো বের করে নিয়ে এলো ভাগ্যধর। ও বিড়ি ধরাল। গোবর্ধন, বলরামও। কপালে গুঁড়ো গুঁড়ো ঘাম। গামছা দিয়ে ঘামটা মুছে নিতে নিতে ও বলল, 'বাবুরা ত জঙগল দেইখ্‌বেন, এ পথে নয়।' ওরা অন্যপথ ধরল। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত।

সুজিত বলল, 'আমরা তো কিছু টেরই পাইনি মাঝিদা।'

ভাগ্যধর হাসল। সরল হাসি। বিড়ি টানতে টানতে ও বলল, 'সব দিকেই কড়া নজর রাইখতে হয় গো বাবু। একবার ধরা পইড়লে কি আর উপায় ছেল ? আপনারাই বা কি ভাইব্‌তেন।'

সত্যিই তো ! ধরা পড়লে কি তারাই ছাড়া পেত ? বনে ঢুকবার অনুমতিপত্র চাই। পাস নিয়ে ঢুকতে হয়। তাদের কি আছে ? কিছুই নেই। সুন্দরবন দেখতে চাইলেই কি দেখা যায় ? তারা এখন এই খাল সেই খাল করতে করতে অনেক ভেতরে চলে এসেছে, কোন কথাই শুনবে না বনবিভাগের লোকরা। হয়রানির একশেষ করবে।

ওরা একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে এগোচ্ছে। চারপাশেই জঙগল। নদী। কোথাও কোন শব্দ নেই। জলের দিকে তাকান যায় না। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে। নানারকমের গাছ, ঝোপঝাড় ও লতাপাতা। ওরা কিছুই চেনে না।

যেতে যেতে পলাশ একসময় জিজ্ঞেস করল, 'এসব কি গাছ মাঝিদা ?'

'ওগুলো গরাণ।'

'কি কি গাছ হয় এখানে?' সুজিত প্রশ্ন করে।

ভাগ্যধর জবাবে বলল, 'গাছ ত বাবু অনেক জাতেরই আছে। সব চাইতে দামী গাছ সুঁদরী, সে আর অ্যাহন দেহা যায় না। তারপর ধুঁধুল গেমা কেওড়া বানী এই রকম আরো অনেক গাছই আছে।'

'ওই যে বাবু কেওড়ার জংগল।' বলরাম বাঁয়ে আঙুল তুলে দেখাল।

ভাগ্যধর বিড়িটায় শেষ কটা টান মেরে ফেলে দিল। তারপর ওদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'একটা জিনিস খেয়াল কইর্ছেন নি বাবু?'

'কি?'

'যেহানে গরাণ তো গরাণই, কেওড়া তো কেওড়াই। আবার যেহানে বানী সেহানে বানীই। এহানের এই এক মজা।'

'ওই যে ধুঁধুল গাছ বাবু।' গোবর্ধন জংগলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'কোথায়?'

'ওই ত, বেলের মতন ফল ধরিছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি।'

ভাগ্যধর এরই জের টেনে বলল, 'এ গাছে ভাল গুঁড়ি হয় বাবু, ঘরের খুঁটিও হয়। এর কাঠ দিয়া পেন্সিল হয়। গরাণ, সিংড়া জ্বালানির পক্ষে ভাল।

গোবর্ধন বলে, 'গেমা গাছে দেশলাইয়ের খোল, বাক্স তৈরী হয়। কলকাতার বাজারে গেমা কেওড়ার খুব কদর আছে বাবু।'

'ওই দ্যাহেন বানী গাছ। বানী গাছের মধু খুব ভাল।'

এমনি করেই ওরা একটার পর একটা গাছ-গাছালির পরিচয় দিয়ে যায়। তরা গাছ, গোলপাতা, পরেশ পিপল্, আকাশমনি, আমুর আরো কত গাছপালার নাম বলে ওরা।

এমন সময় সুজিত চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই দেখ বাঁদর!'

ওরা তাকল। বাঁদরগুলোও ওদের দেখতে পেয়েছে। কিচ কিচ শব্দ। ডালে ডালে ওরা লাফাচ্ছে। পাতা ছিঁড়ছে, ডাল ভাঙছে। অনিন্দ্য মুখ ভেংচাল। ওরাও পাল্টে মুখ ভেংচায়। এরা হি হি করে। ওরাও দাঁত বের করে খিক্ খিক্ করে। ধীরে ধীরে নৌকো এগিয়ে চলে। ভাগ্যধর কি যেন দেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে। তার চোখে ধারাল দৃষ্টি। কান খাড়া করে রাখে। জংগলের ভেতরে কোন শব্দ শোনার চেষ্টা করে। গোবর্ধন বলরামের চোখও এখন সেদিকেই। হঠাৎ বাঁদরগুলোর কি যেন হলো। ওরা ভয় পেয়েছে। চিৎকার করতে করতে প্রাণপণে ওরা পালাচ্ছে। গোবর্ধন, বলরাম সচকিত হলো। চোখে মুখে আতংক।ওরা বুঝতে পারে একটা বিপদ যেন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। জংগলের মেজাজ মর্জির সংগে ওদের অনেককালের পরিচয়। ভাগ্যধর গোবর্ধনদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাড়াতাড়ি দাঁড় টাইনে চলরে তরা।'

অনিন্দ্যরা কিছু বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল্ চোখে চেয়ে থাকে।

'ওই দ্যাহেন বাবু, বান্দরগুলান পালাইচ্ছে!'

'তাই তো, কি ব্যাপার মাঝিদা?'

'ব্যাপার আর কি বড় মিত্রা।' গোবর্ধন ফিস ফিস করে জবাব দিল।

ভাগ্যধর ফিস ফিস করে বলল, 'বাবু, জংগলে চোখ-কান সজাগ রাইখ্তে হয়। পশুপাখির চলাফিরা দেইখে আমরা অনেক কিছুই বুইঝ্তে পারি।'

ছোট খাল। দুপাশে জংগল। ওদের চোখে ভয়। 'বাবুরা একটু সাবধান গো, চাইরদিকে নজর রাইখ্বেন। দোহাই সত্যপীর, দোহাই বনবিবি।'

অনিন্দ্যরা থ। জংগল এখন ওদের খুব কাছে। জলের সোঁ সোঁ শব্দ। একটা অস্বস্তি। এখন যদি বন থেকে কেউ লাফিয়ে পড়ে ওদের ওপর! বুকের ধক ধক আওয়াজটাও যেন শুনতে পাচ্ছে ওরা। চোখ খালি চারদিকে ঘুরছে। বেশ একটা উত্তেজনা। মাঝিদা গুণিন। বাঘ বশের মন্ত্র জানে ও। মাঝিদা এখন বিড় বিড় করছে। চোখের কোলে কিসের এত আতংক। গাঁয়ে কাঁটা দেয়। শির শির করে মেরুদন্ড দিয়ে যেন কি নামছে।

যাক, ছোট খাল থেকে ওরা বড় গাঙে পড়ল। আর ঠিক সেই সময়ই, ভাগ্যধরের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। গোবর্ধন বলরামের চোখেও ভয়ের ছোঁয়া। ভাগ্যধর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে কোন কথা ফোটে না। আকাশে এতক্ষণে মেঘ জমেছে। ওই মেঘের রঙ দেখে ও আঁতকে উঠেছে। গাছের পাতা সর সর করে উঠল। একটা বাতাস উঠছে। নদীর জল ফুলছে। ছোট খালটায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। জংগলের ভেতরেও ভয়। দেখতে দেখতে একটা চটকা বাতাস এসে নৌকোয় আছড়ে পড়ল। ভাগ্যধর শক্ত মুঠোয় হাল ধরেছে। বনের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। নৌকো একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। ওদের মুখ

শুকিয়ে গেছে। এখানে একবার নৌকো উল্টোলে, আর ভাবতে পারে না পলাশরা। আকাশটা যেন ওদের ওপর হুড়মুড় কর ভেঙে পড়বে। গোবর্ধন বলরাম বাতাসের গতি বুঝবার চেষ্টা করে। ভয়ে ওদের মুখে আর কোন কথা নেই। স্রোতের টানে নৌকো ছুটে চলেছে। এখন আর নৌকোর মুখ ফেরাবার কোন উপায় নেই।

মাঝে মাঝে নৌকো এমন ভাবে কাত হয়ে পড়ছে যে,উল্টে যায় আর কি! বুক ধড়াস ধড়াস করে। সাঁ সাঁ শব্দে পাক খাচ্ছে। যেন চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়া ছুটেছে। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হলো। বাতাসের তেজ সামান্য কমল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝনর ঝনর বাজ পড়ছে। জংগলের মধ্যে সেই শব্দ ধাক্কা খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চটকা বাতাসের ঝাপটা। দেখতে দেখতে যে এরকম একটা ঝড় উঠবে, ভাবতে পারে নি ওরা। নদী অশান্ত। বাতাস এলোমেলো।

ভাগ্যধর বিড়বিড় করে কিসব আউড়ে যাচ্ছে। ওর তখন আর কোনদিকে খেয়াল নেই। ভুবনদা বলেছে, ও পাকা মাঝি। কথাটা মিথ্যে নয়।

গোবর্ধনই প্রথম দেখল। দেখেই মাথায় হাত। সংগে সংগে চিৎকার, ভাগ্যদা গো আর বাঁচনের আশা নাই।'

ভাগ্যধর চমকায়, 'কি হল?'

চমকায় ওরা সবাই।

'নৌকায় জল ঢুকত্যাছে।'

'সব্বনাশ! আর দেরি করিস না, জল ছেইচা ফ্যাল্।'

বলরাম জল ছেঁচতে লাগল। নৌকোর গায়ে একটা ফুটো। সেই ফুটো দিয়েই জল ঢুকছে। গোবর্ধন গায়ের গামছা দিয়ে গর্তটা বন্ধ করতে চাইছে, পারছে না।

সুজিতদের চোখ তখন কপালে উঠেছে।

'বাবুরা আপনারাও হাত লাগান।'

পলাশ, অনিন্দ্য বলার সংগে সংগে জল ছেঁচতে শুরু করেছে, সুজিত একটা জামা ঠেসে ধরেছে ফুটোটায়।

'লড়াচড়া কইর্বেন না বাবুরা।' ভাগ্যধর সাবধান করে।

এমনি করে আরো আধঘন্টা কাটল। ধীরে ধীরে আকাশের মেঘ পাতলা হলো। বাতাস অনেকটা এখন নরম। জলের ফোঁস ফোঁসানি কমেছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আর ঠিক তক্ষুনি, নৌকোটা এসে একটা চরায় ধাক্কা খেল।

পলাশরা তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটু দূরে নদীর কোল ঘেঁষে সবুজ ঘাস। যেন কে সবুজের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে এখানে। সামনে নদী। বোধ হয় সমুদ্র বেশী দূর নয়। বাতাসে একটা গর্জন কানে আসছে। সবুজ ঘাসের পেছনেই ঘন ঝাউবন। জংগল। ওরা চরায় নামল।

ভাগ্যধর নিষেধ করল, 'বাবুরা, আগে নৌকায় গিয়া বসেন। জায়গাটা বুইঝা নিই।' ও তীক্ষ্ণনজরে

চারদিকে তাকাতে থাকে।

এখন ভাঁটা। আস্তে আস্তে আকাশ আরো পরিষ্কার হলো। বৃষ্টি থেমে গেছে। আবার রোদ উঠেছে। কে বলবে যে একটু আগেই এক প্রলয় কান্ড ঘটে গেছে।

তাকাতে তাকাতে ভাগ্যধরের মুখ ফ্যাকাশে হলো। চোখের জমিতে আবার এক আতংক গাঢ় হতে থাকে। একটু চুপ করে থেকে ভয়ার্ত গলায় ও বলল, 'বাবু আমরা আরো এক ভয়ংকর জায়গায় চইলা আইস্‌ছি।

গোবর্ধনও চিনতে পেরেছে। ভয়ে মুখ শুকনো। কোন রকমে ও বলল, 'এ যে চামটায় আসি পড়িছি। অ্যাহন উপায়?'

ভাগ্যধর নৌকো থেকে নামল। বলরামও নেমে পড়েছে। ওরা নৌকো নোঙর করল। শরীর ক্লান্ত। এতক্ষণ কি ধকলই না গেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো কোথায়! বরং দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা আরো বেড়েছে। নৌকোর অনেকটা জায়গা ফুটো হয়ে গেছে। ওটাকে আগে সারাতে হবে। না পারলে, আর ভাবতে পারে না ওরা। হায় হায়, এ কোন্ নতুন বিপদ ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল? আর কিছুক্ষণ পরেই ভাঁটা শেষ হয়ে যাবে। জোয়ারের জল বাড়বে। দেখতে দেখতে চরাটা জলের তলায় চলে যাবে। বালি ভেজা ভেজা। জলে কুমীর। একটু আশ্রয় তো চাই! কিন্তু কোথায়!

এত সুন্দর জায়গা পলাশরা জীবনে দেখেনি। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে নদী। ঢেউ। শব্দ। পশ্চিমের দিকে জংগলটা খুব কাছে। এখন আর গাছপালা দেখার কোন উৎসাহ নেই ওদের। মাঝিদা বলেছে, ভয়ংকর জায়গায় তারা চলে এসেছে। শোনার পর, ওদেরও বুকে জল নেই। ওরা ছাড়া এখানে আর কোন মানুষজনও নেই। চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না। শুধু প্রতিধ্বনি জংগলে ঠোক্কর খেতে খেতে দূরে, আরো দূরে মিলিয়ে যাবে। এদিকে নৌকো বিকল।

ভাগ্যধর বলল, 'আমরা অ্যাহন তেনাদের রাজিত্বে আইসা পইড়্‌ছি।'

'এখান থেকে এখন যাব কি করে মাঝিদা?' পলাশের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

'সেইভাবেই ত ভাইব্‌তেছি। এহানে থাইক্‌লে পরান নিয়া আর ফিরন লাইগ্‌ব না।'

'তাহলে?'

ভাগ্যধররা অনেক চেষ্টা করছে নৌকোর ফুটো বন্ধ করবার। সুজিতরাও ওদের সংগে হাত লাগিয়েছে। অনেক চেষ্টায় তা বন্ধ হলো। কিন্তু ভয় গেল না। জলের ধাক্কা লেগে লেগে আবার না ওটা খুলে যায়!

'বাবুরা খাইয়া নেন গো, খুব খিদা পাইছে।'

ক্ষিধে ওদেরও পেয়েছে। সেই কখন দুটো খেয়ে বেরিয়েছিল। ওরা একসংগেই বসে চিঁড়ে গুড় খেল। জল খেল।

তখন বিকেল হয় হয়। নদীর জলে ছায়া নেমে আসছে। একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। জামা প্যান্ট শুকোয় নি। ওরা আর এক জোড়া করে সংগে এনেছিল। চটপট পরে নিল। টর্চ বের করল।

'বাবুরা অ্যাহন একটাও কথা কইবেন না।'

সবাই চুপ করে আছে। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। আরো খানিকটা সময় পার হয়ে গেল। বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। জলের ভেতরে অন্ধকার জমছে। সেই অন্ধকার নদীর বুকেও ছড়িয়ে পড়ে। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে। এভাবে আর কতক্ষণ ওরা এখানে অপেক্ষা করবে! পলাশ ভাগ্যধরের দিকে তাকাল। ভাগ্যধর চোখের ইশারায় কথা বলতে বারণ করল। ওরা নৌকোর ওপর। গোবর্ধন মাটিতে। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। জল বাড়ছে।

'এই দ্যাহেন বাবু, চরা ডুইবতাছে।' ফিস ফিস করে বলল ভাগ্যধর।

একটু পরেই ওরা সেই দৃশ্যটা দেখল। এই বিপদের মধ্যেও ওরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। অতি সাবধানে কতগুলো হরিণ ওই সবুজ ঘাসের কাছে চলে এসেছে। ওরা দেখতে পায়নি ওদের। আস্তে আস্তে জলের কাছে এলো। চুক চুক করে জল খেল। হঠাৎ পাতার খস খস এক শব্দ হলো। মুহূর্তে দে ছুট।

একটু একটু করে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। খাঁ খাঁ নির্জনতা। জংগলের দিকে তাকালে শরীর শির শির করে। মনে হয়, কালো কুচকুচে, কিম্ভূতকিমাকার কি একটা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শত শতাব্দী ধরে যেন অন্ধকার দিয়ে দিয়েই এই মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। বেশীক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দেহ রোমাঞ্চিত হয়। খালি মনে হয় কি একটা অশুভ অশরীরী তাদের চারপাশে ঘুরছে, ঘুরছে। ওরা পা পা করে এগিয়ে আসছে। হাওয়ায় শিস দিচ্ছে। নদীর জল

ঘুরছে। হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। আর দেরি নয়, দেরি নয়। চরাটা একটু একটু করে জলের তলায় চলে যাচ্ছে।

গোবর্ধন নোঙর তুলল। খানিকটা এগোতেই ওরা দূরে একটা নৌকো দেখতে পেল। এই নির্জন আর ভয়ংকর জঙ্গলে, যাক, কয়েকজন সাথী পাওয়া গেল। বুকের বল বাড়ে। ভাগ্যধর অনেকক্ষণ ধরেই কি একটা ভাবছিল। মুখের ওপর এক অস্বস্তি ছড়ানো ছিল। এরই মধ্যে নিস্তব্ধতা বাড়ছে। জঙ্গলের প্রাণীরা জাগছে। রাত্রে নৌকো চালানর বিপদ আছে। এত নদী খাল খাঁড়ি যে,পথ ভুল হতে পারে। তাছাড়া বনের দেবী তাঁর বাহনের ওপর চড়ে জঙ্গল ঘুরে বেড়ান। তাঁকে ভয় ভক্তি করতে হয়। আজ রাতের মত নৌকো কোথাও নোঙর করতে হবে। আরো একটা নৌকো দেখতে পেয়ে ভাগ্যধররা খুশি হলো। মনে হলো ওর অস্বস্তি খানিকটা কাটল। কি ভেবে ভাগ্যধর হাঁক দিল, 'কার নৌকো যায় গো ?' বাতাসে সেই শব্দ কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল।

ওদিক থেকে জবাব এলো, 'সাতজেলিয়ার, নগেন দাসের নৌকো।'

ভাগ্যধর গোবর্ধনদের বলল, 'তাড়াতাড়ি চালায়ে চল, ওই নৌকোডা ধইরতে হবে।'

পলাশরা কিছু বুঝতে পারল না। ওরা তাকিয়ে থাকল। আকাশে মিট মিট করে অজস্র তারা জ্বলছে। নদীর বুক থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। সুন্দরবনের অন্ধকার চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ধরেছে।

ওদের নৌকো বড় নৌকোর কাছাকাছি এলো। কাঠ বোঝাই। ওই নৌকোর মাঝি ভাগ্যধরের চেনা। ওরাও খুশি হলো। ভাগ্যধর তো শুধু মাঝি নয়। বাউলীও। সঙ্গে ওর মতন একজন গুণিন থাকলে আর ভয় কি। ভাগ্যধর ওকে কি সব বলল। ওই নৌকোর মাঝিরাও পলাশদের দেখে অবাক হয়ে গেছে। ভাগ্যধর বলল, 'হোগলডুরীর ভুবন জানা আমাদের খুড়া গো, তার কুটুম্ব, কইলকাতায় থাকে, জঙ্গল দেইখ্‌তে আইস্‌ছে। তারপর ত এই বিপদ। হঠাৎ ঝড় উইঠ্‌ল।

কথা বলতে বলতে ওরা এগোচ্ছিল। একটা মাঝারি খালে এসে ওরা নৌকো নোঙর করল। ছোট নৌকোটা বড়টার গা ঘেঁষে আছে। একটু দূরেই জঙ্গল। ভাগ্যধর বলল, 'বাবুরা, এইবার গিয়া ওই নৌকায় উঠেন। রাইতে এই ছোট নৌকায় না থাহাই ভাল।

সুজিতরা একটু ইতস্তত করল। ওই নৌকোটা না পেলে তো ওরা এখানেই থাকত। তাছাড়া, একসঙ্গে এসেছে, একসঙ্গেই থাকবে। পলাশ বলল, না মাঝিদা, আমরা এখানেই থাকব।'

ভাগ্যধর একটু যেন বিরক্ত হলো, বলল, 'আহা, যা কই শুনেন বাবু।'

ওরা গিয়ে বড় নৌকোয় উঠল। পাটাতনের ওপর দাঁড়াবার জায়গা নেই। কাঠে বোঝাই নৌকো। শুধু মাঝির গলুইয়ের একটু ফাঁকা জায়গা। ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। দু পাশে জঙ্গলের ভেতরে চপচপ শব্দে খাঁড়ির জল ঢুকছে। পলাশ টর্চের আলো ফেলে।

কিছুই দেখা যায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঝিরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করল। ওদেরও তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিতে বলল। মাঝিরা খেয়েদেয়েই গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি। শুয়েই ঘুম।

পলাশরাও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার কাছে ছোট একটা জানলা। জানলাটা সামান্য খুলে রেখেছে ওরা। সেই খোলা পথে হাওয়া ঢুকছে। ওদের চোখে ঘুম আসে না। শান্ত স্তব্ধ চরাচর। শুধু জলের কলকল শব্দ। রাত বেশী হয় নি। এরই মধ্যে গভীর নিশুতি যেন। সদ্য কাটা গাছের একটা গন্ধ। ওরা সেই খোলা জানলা দিয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকল। সারাদিনটা কী ভয়ংকর উত্তেজনার ভেতর দিয়েই না কাটল ওদের! এরকম একটা জায়গায় নৌকোর ওপর যে রাত কাটাবে, ভাবতেও পারে নি ওরা। কী সাংঘাতিক ঝড়েই না পড়েছিল। তার ওপর নৌকোয় জল। ভাবলে এখনও বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। ওদের আর আফশোষ নেই। বাঘ, কুমীর না দেখলেও হরিণ দেখেছে। একসময় জানলা বন্ধ করে দিল ওরা। মাঝিদা ওদের বারবার করে সাবধান করে দিয়েছে, বাইরে না বেরোতে। ওরাও হয়ত এতক্ষণে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। এসব ভাবতে ভাবতে পলাশদের চোখেও ঘুম আসে।

রাত তখন কত খেয়াল নেই। সুজিতের ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। পলাশ অনিন্দ্যও উঠে বসেছে। তাদের নৌকোটা দুলছে। একটা গোঙানির শব্দ। অল্প পরেই ভয়ার্ত আরো কয়েকটা কন্ঠস্বর। বড় শিয়াল গো, বড় শিয়াল, নিয়া পলায়ে যায় দ্যাহ। ঝন করে একটা বিদ্যুৎ বয়ে গেল ওদের শিরা-উপশিরায়। এ যে গোবর্ধনের গলা মনে হচ্ছে। তড়াক করে উঠে পড়ে ওরা। হাতে টর্চ। এই নৌকোর মাঝিরাও তরাসে জেগে উঠেছে। তিনজনের হাতের টর্চ জ্বলে উঠল। ওই ছোট নৌকোতেই ঘটনাটা ঘটেছে। টর্চের আলোয় ওরা শুধু এক পলক দেখল। বৈঠা নিয়ে গোবর্ধন তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। একটা হলুদ কালো ডোরা। ভয়ংকর হিংস্র আর ধূর্ত দুটো চোখ। চোখে আগুন। হয়তো চিৎকারে, এতগুলো আলোয় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল এই বনের সত্যিকারেরই রাজা। সত্যপীরের বাহন। কিন্তু পর মুহূর্তেই শিকার মুখে নিয়ে ঝপাৎ করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে পাড়ে গিয়ে উঠল। গা ঝাড়া দিল। একবার তাকাল ওদের দিকে। তারপর শিকার নিয়ে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। কাকে, কাকে নিল?

গোবর্ধনদের নৌকোয় তখন কান্নার রোল। সবাই অবাক। শেষে ভাগ্যধরই চিরকালের মতন জঙ্গলে হারিয়ে গেল। ও তো মন্ত্রসিদ্ধ বাউলী। তাহলে? বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে পলাশদের। ওদের চোখেও জল। তখনো রাত শেষ হয় নি।

ভোরের আলো ফুটতেই ওরা আবার সেই অভিশপ্ত নৌকোয় ফিরে এলো। গোবর্ধন মাঝে মাঝে বুক চাপড়ে হাউমাউ করে উঠছে। বলরাম বোবা হয়ে গেছে। তার দৃষ্টি উদাস। ওরাও কেউ আর কোন কথা বলতে পারছে না। মাঝিদা কেন যেন ওদের নৌকোয় পাঠিয়ে ছিল এখন সব বুঝতে পারল। বুকটা খচখচ করে। ওদেরও কথা হারিয়ে গেছে।

আরো খানিকটা একসঙ্গে এসে ওদের নৌকো আলাদা হলো।

গোবর্ধন আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'বাবু গো, ভাগ্যদার এই মরণের কথাডাও পাঁচকান করতি পারা যাবে না। পাছে গভরমেন্টের লোকেরা জানি যায়, তার ডরে গলা ফাটায়ে কানতি পারার উপায় নাই। ঝানতি পারলে আরও হুজ্জুত।'

বলরাম একসময় ফুঁপিয়ে উঠল।

পলাশরা নির্বাক। সান্ত্বনা দেবার ভাষাও ওদের নেই। কি বলবে! এই তো এখানকার গরীব মানুষদের নিয়তি! ওই জঙ্গলই তো ওদের কাছে শেষ সম্বল। বাঁচন মরণের আশ্রয়। ওই জঙ্গল বার বার ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডেকে নিয়ে যায়। কেউ ফেরে, কেউ ফেরে না। এর হু হু করা খাল, বিল, নদী, গাঙ, খাঁড়ির বাতাসে গেমা গরাণ, বানী, হেঁতাল, গোলপাতার আনাচে কানাচে আজো এমনি কত যে কান্না ভেসে বেড়ায় এর কি শেষ আছে! মাঝিদার মুখটা বারবার ভেসে উঠছে। ওরও বাড়িতে বড় ছেলে মেয়ে, বুড়ো বাপ রয়েছে। ওরা যখন এই বুক ফাটা খবরটা শুনবে? কাঁদতেও পারবে না ওরা। হায় রে! বুকের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। এখনো মাঝিদার কথাগুলো ওদের কানে বাজছে, 'বাবু, এহানে মাইনষের দাম নাই, বড় মিক্রার খাতির আছে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা গো বাবু।' পলাশরা কি দেখতে এসেছিল, আর কি অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যাবে। মাঝিদার কথা ভাবতে ভাবতে ওদের চোখও এই মুহূর্তে বারবার অশ্রুসজল হয়ে উঠছে। মনে মনে যেন বলতে ইচ্ছে হলো, বিদায়, বিদায়, বিদায় সুন্দরবন। বিদায় মাঝিদা।

ছবি □ ধীরেন শাসমল

খোকনমণি

হাসিরাশি দেবী

ও আমাদের খোকনমণি
কিসের অভিমান,
কে মেরেছে চোখ রাঙিয়ে
ঐ মাথাটা জোর ঝাঁকিয়ে
কে মলেছে কান?
সে জানে না মোদের সোনা
মোদের তুমিই মাণিক
দুধ আনাব কন্ট্রোলে আর
হীরের টুকরো খানিক,
সেই কথা আর কে-ই বা জানে!
ভাগ্যে জানেনাকো–
তুমি মোদের বুকের মাঝে
মুখটা ঢেকে রাখো,
পরনি নয় ছোট্ট ইজের
আঙুলটা নয় চুষেছ ঢের,
তাই বলে কে এমন করে
করবে অপমান,
এবার এসে আমায় বলো–
মুচড়ে দেব কান।
ও আমাদের খোকনসোনা
ধুলোয় ভরা গা,
কে তোমারে নোংরা বলে
কে-ই বা শোনে তা!
তুমি কেবল চুপ্‌সে থাকো
কথাটি না বলে,
ছোট্ট কাঁথায় পিঠটি ঢেকে
মাসি-পিসির কোলে।
না হয় করো হাঁটাহাঁটি
ছুঁড়েই ফেলো দুধের বাটি
তাই বলে কে এমনতরো
করতে পারে শাসন
মা আর মাসি-পিসির কোলে
ঘুমোয় যারা সময় হলে,
কাঁথায় পাতা থাকে তাদের
চিরকালের আসন।

শেয়ালী আর ভালুকের গল্প

মানস মজুমদার

একটা শেয়ালী আর একটা ভালুককে নিয়ে এই গল্প।

ভালুকের রান্নাঘরের সামনে ছিল একটা সবজি বাগান। একদিন শেয়ালী এল তার কাছে। বলল, 'ভালুকদা, তোমার সবজি বাগানটা তো খালিই পড়ে থাকে। আমি যদি ওখানে শালগমের চাষ করি, তোমার আপত্তি আছে?'

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে দেখল ভালুক। ভাবল, মন্দ কি! শেয়ালী খেটেখুটে চাষ করুক। ফসলের একটা ভাগ আদায় করে নিলেই চলবে। তবে চুক্তিটা আগাম ঠিক করে নেওয়াই ভাল। ভালুক তাই শেয়ালীকে জিজ্ঞেস করল, 'দ্যাখ শেয়ালী, চাষ করতে চাও কর, কিন্তু জমিটা তো আমার। আমারও তো কিছু পাওয়া চাই। ফসল ফললে একটা ভাগ কিন্তু আমাকে দিতে হবে। তা ভাগটা কেমন হবে শুনি?'

শেয়ালী মোলায়েম গলায় বলল, 'ঠিকই তো। এমনি এমনি তুমিই বা কেন চাষ করতে দেবে ভালুকদা? আর আমিই বা তা হতে দেব কেন? জমি তোমার। ফসল হলে তার একটা ভাগ তোমার ন্যায্য পাওনা। তা বেশ তো, মাটির ওপরে যা ফলবে তা সব তোমার, আর মাটির নিচের শেকড়-বাকড়গুলো আমাকে দিও। বল, রাজি?

প্রস্তাবটা ভালই লাগল ভালুকের। বেচারা জীবনে শালগমের চাষ দেখেনি। ভাবল, কয়েকটা শেকড়-বাকড় বৈ তো নয়। তা দেওয়া যাবেখন শেয়ালীকে। রাজী হয়ে গেল সে শেয়ালীর কথায়।

শেয়ালী সেখানে শালগমের চাষ করল।

ফসল তোলার সময় হলে ভালুককে ডাক দিল শেয়ালী, 'ভালুকদা, কথামতো গাছের ওপরের অংশগুলো তোমার জন্য রইল, শেকড়-বাকড়গুলো নিয়ে চললুম আমি।'

তার পাওনা ভাগটুকু নিয়ে চলে গেল শেয়ালী। ডাঁটা সমেত শালগমের পাতাগুলো শুধু পড়ে রইল ভালুকের জন্য। সেগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে হতাশ হল ভালুক। কোনো কাজেই লাগবে না সেগুলো। মাটির নিচে খুঁজে পেতে দেখতে লাগল, যদি দু'একটা শালগম পড়ে থাকে। কিন্তু না, মিথ্যে খোঁজা। যা ছিল সবই তুলে নিয়ে গেছে শেয়ালী। মনে মনে দারুণ চটে গেল ভালুক। 'এঃ, শেয়ালীটা দেখছি বড্ড ঠকিয়েছে। ঠিক আছে, এবার এস না, আমার বাগানে চাষ করতে। দেখাচ্ছি মজা!' আপন মনে গজ গজ করতে লাগল ভালুক।

বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। শেয়ালীর পাত্তা নেই। কিন্তু গ্রীষ্ম পড়তে না পড়তেই ভালুকের কাছটিতে আবার হাজির হ'ল শেয়ালী। বলল, 'ভালুকদা তোমার সবজি বাগানটা তো খালিই পড়ে আছে। আমাকে কয়েকটা পোস্ত গাছ লাগাতে দেবে?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করল ভালুক। ভাবল, এবার আর ঠকছি না। হুঁ, ভাগের কথাটা আগাম ঠিক করে নিই। 'শোনো শেয়ালী, এবার কিন্তু মাটির নিচের ফসলগুলো আমার। রাজি থাক, পোস্ত গাছ লাগাও।' ভালুক বলল।

শেয়ালী খুশি। পোস্তর বীজ ছড়িয়ে দিল জমিটায়। দেখতে দেখতে পোস্তর চারাগুলো বড় হয়ে গেল। ফুল এল গাছগুলোয়, দানা ধরল, দানায় পাক ধরল, সেগুলো গাছ থেকে তুলে নেওয়ার সময় হল।

'ভালুকদা এস, ফসলের ভাগ নাও।' শেয়ালী ডাক দিল ভালুককে।

কথামতো ভাগ হল। পোস্ত গাছ আর দানাসমেত ফুলগুলো তার বাড়িতে নিয়ে চলে গেল শেয়ালী। ভালুকের জন্য রইল শেকড়-বাকড়গুলো।

এবারেও ঠকতে হ'ল ভালুককে। দানা সমেত শুধু ক'টা ছোট্ট ফুল মাটিতে পড়েছিল। ভুল করে ফেলে গেছে শেয়ালী। ফুলটা মুখে দিয়েই পোস্তর স্বাদ পেল ভালুক। বুঝল, ঠকে গেছে সে শেয়ালীর কাছে।

'এঃ, পাজী শেয়ালীটা এবারেও ঠকিয়ে গেল। আচ্ছা, এবার এস ঠকাতে, মজাটা টের পাবে।' আপন মনে গজগজ করতে লাগল ভালুক।

ঘুরে-ফিরে আবার এল গ্রীষ্মকাল। শেয়ালীও আবার এল ভালুকের কাছে– 'ভালুকদা, তোমার সবজি বাগানটা তো খালিই পড়ে আছে। আমাকে চাষ করতে দেবে?'

রাগে গজরাতে লাগল ভালুক, 'দ্যাখ, দু' দু'বার তোমাকে দয়া দেখালুম। আমার জমিতে চাষ করতে দিলুম। কিন্তু দু' দু'বারই তুমি ঠকালে আমাকে। জমিটা থেকে কিছুই পেলুম না।'

গলাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করল শেয়ালী–'দোহাই ভালুকদা, যা হবার হয়ে গেছে। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি বল! বেশ তো, তুমি কি চাও আগাম জানিয়ে দাও।'

'ঠিক আছে, এবার তুমি যাই চাষ কর না কেন, মাটির ওপরের ফসল আমাকে দিতে হবে।' ভালুক ঝাঁঝালো গলায় বলল।

রাজী হয়ে গেল শেয়ালী। চাষ করল গাজরের। বড় হতে লাগল গাছগুলো। গাজর তোলার সময় হ'ল। মাটি খুঁড়ে তুলতে হবে গাজরগুলো। ভালুককে তাই ডাক দিল শেয়ালী–এস ভালুকদা, ফসলের ভাগ নাও।' কথা মতো গাছের ওপরের অংশ ভালুককে দিয়ে মাটির নিচ থেকে গাজরগুলো তুলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল শেয়ালী।

এবারেও ঠকে গেল ভালুকটা। রাগে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

ছবি □ কিশোর সাহা

ট্যাপা-টেঁপী

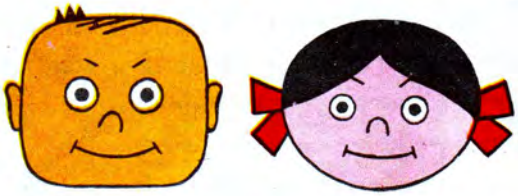

উদয়শংকর গঙ্গোপাধ্যায়

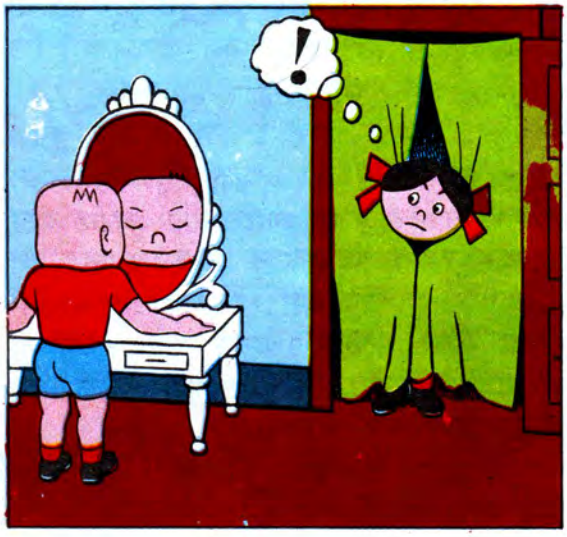

মজারু প্রাণীর মারাত্মক লীলা

অদ্রীশ বর্ধন

কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! নোটিশ-ফোটিশ না দিয়েই, এতটুকু হুঁশিয়ার হওয়ার সুযোগ না দিয়েই—ধাঁ করে শুরু হয়ে গেল পিলে-চমকানো পরিবর্তন.... আকার পরিবর্তন!.... আয়তন পরিবর্তন!.... চক্ষুস্থির করার মতো অসম্ভব, অবিশ্বাস্য পরিবর্তন!.... অতিবড় দুঃস্বপ্নেও মানুষ যা কল্পনাও করতে পারবে না.... সৃষ্টিছাড়া সেইসব পরিবর্তন ঘটে চলল একটার পর একটা!.... শেষ নেই.... শেষ নেই মজারু প্রাণীর মজা-বার-করে দেওয়ার মতো মারাত্মক লীলা খেলার। সাবধান। মাথার চুল খাড়া হয়ে যেতে পারে. পড়তে পড়তে....!

কি কুক্ষণেই তার নাম দিয়েছিলাম মজারু। নামটা মাথায় এসেছিল অবিশ্যি 'সবজান্তা মজারু' পত্রিকাটা পড়তে পড়তে। এত মজার মজার গল্প ছাপায়! দু'শোবছর ধরে ফি-মাসে বেরিয়ে যাচ্ছে এই একখানা কাগজ। সোজা কথা? দু'হাজার একশ তিরাশি সালেও 'সবজান্তা মজারু' নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে দেশে-বিদেশে। অনেক ভাষায় ছেপেও কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

আমরা, মানে এই স্পেসম্যানরা, 'সবজান্তা মজারু' বগলে নিয়ে বেরোই মহাকাশে টহল দিতে। একঘেয়েমি তো কাটে। এত মজা আর পাবো কোথায়!

ঘটনার শুরু একটা অজ্ঞাত গ্রহে অভিযান-পর্বের শেষ দিনে।

সে এক আশ্চর্য গ্রহ। পৃথিবী থেকে এতদূরে যে এমন চমৎকার ছোট্ট গ্রহ থাকতে পারে, তা কি কেউ ভেবেছিল? অন্য গ্রহ বলতেই পাঁচজনের ধারণা না জানি উদ্ভট কাণ্ডকারখানার দেশ।

মোটেই না, মোটেই না। এত ভালো, এত সুন্দর গ্রহ আমরা খুব কম দেখেছি। তবুও তাকে আশ্চর্য গ্রহই বলব—শুধু এই মজারু-প্রাণীটার জন্যে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই অভিযান চালিয়েছিলাম অজানা সেই গ্রহে। কত অদ্ভুত নমুনাই না সংগ্রহ

করলাম, তা আর বলে শেষ করতে পারব না। সব নমুনাই গুছিয়ে রাখলাম আমাদের লাল টকটকে মহাকাশযানে। হলুদ ঘাস প্রান্তরের ওপর ছুঁচোলো মুখটা ওপর দিকে তুলে দাঁড়িয়েছিল সেই স্পেসশিপ।

ভালো কথা, এই ফাঁকে বলে রাখি, অজানা এই গ্রহের নাম দিয়েছিলাম হলুদ গ্রহ। কেননা, পৃথিবী যেমন সবুজ, গাছপালা সবুজ রঙের বলে–এ গ্রহ তেমনি হলুদ, গাছপালা ঘাস সমস্তই হলুদ রঙের বলে। উঁচু পাহাড় কোথাও নেই। সবই বেঁটে–কিন্তু তাও হলুদ শ্যাওলা আর অদ্ভুত গুটিপোকার মতো এক রকমের ঝোপঝাড়ের জন্যে। একটা গাছ এমনই সৃষ্টিছাড়া যে, না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। কাণ্ডটা বুনো ওলের মতো। তা থেকে হাত বেরিয়েছে দশ বারোটা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ হাত। লিকলিকে, কিলবিলে দশ-বারোটা হাত। অবিকল মানুষের হাতের মতোই আঙুলও আছে, তবে চারটে-পাঁচটা নয়। প্রথমবার দেখেই অবশ্য আমাদের গা শিরশির করে উঠেছিল। কেননা, আঁকাবাঁকা তেড়াবেঁকা ডালের মতো লম্বা লম্বা হাতগুলো দিব্যি জ্যান্ত। চারদিকে নড়ে নড়ে সরে সরে মাটি থেকে ঘাস খুঁটে খুঁটে ওলের গায়ে একটা ফুটোর মধ্য ঢুকিয়ে দিচ্ছে। শ্যাওলা-ট্যাওলাও বাদ দিচ্ছে না। অথচ চোখ নেই ওলের মতো কাণ্ডের গায়ে। কি করে দেখছে, ভগবান জানেন। গাছেদের নাকি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে। হলুদ গ্রহের অদ্ভুত গাছটাকে দেখে তা হাড়ে হাড়ে বুঝে ছিলাম।

কোমর সমান উঁচু আজব গাছটাকেও টবে পুঁতে দিয়েছিলাম স্পেসশিপে। মজারুর সঙ্গে তার টক্কর লাগল কি করে, কিভাবে–যথাসময়ে তা বলব।

এবার বলি মজারুকে পেলাম কিভাবে।

বেঁটে বেঁটে কিম্ভূতকিমাকার টিলা ঘেরা হলুদ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো হলুদ গ্রহের চারপাশ দেখে নিচ্ছিলাম চোখে দূরবীন লাগিয়ে, অদূরে নীল ধাতুর মেশিন বসিয়ে বাতাসের উপাদান মাপছে ভীমসেন। মেশিনের ওপরে বিরাট একটা লাল রঙের বেলুন। নীল মেশিন, লাল বেলুন, হলুদ ঘাস আর খয়েরী টিলার মাঝে ওর কমলা পোশাক আগুনের মতো জ্বলছে সূর্যের আলোয়।

আমি তন্ময় হয়ে দেখছি, আরো কিছু নমুনা চোখে পড়ে কিনা।

এমন সময়ে ভীমসেন বললে– ঘটোৎকচ।

হ্যাঁ, আমার নাম ঘটোৎকচ। রাক্ষুসি হিড়িম্বার ছেলে মহাবীর রাক্ষস আমি নই কিন্তু। মানুষ ঘটোৎকচ। ঘট মানে হল হাতীর মাথা, উৎকচ মানে কেশশূন্য। আমার মাথাটা বিরাট–মস্তিষ্কের ওজন বেশী বলেই–চুল-টুল একদম নেই মাথায়–বিলকুল তেলতেলে। তাই আমার নাম হয়েছে ঘটোৎকচ। তাছাড়া হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের মতোই আমি সব রকমের অস্ত্রে দক্ষ। মায়াযুদ্ধে পোক্ত নই বটে, তবে অন্য গ্রহের প্রাণীরা রীতিমতো ভয় পায় আমার শক্তিকে। আমার পরাক্রমের কাহিনী নিজমুখে বলে বড়াই করাটা ভাল দেখায় না–তাই আর কিছু বললাম না, তবে আমার ঘটোৎকচ নামকরণের অন্যতম কারণ আমার এই সাহস, শক্তি আর বুদ্ধি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চেহারাটাও মন্দ নয়। কেশ বিরল মাথাটা যেমন বিরাট, গোটা শরীরটাও সেই অনুপাতে বিশাল–ছোটখাট দৈত্য বলতে পারো।

দূরবীন চোখে লাগিয়েই বললাম–'কি বলছো?'

ভীমসেন ঘটাঘট কটাং কড়াৎ করে নীল মেশিনের সুইচ টিপে লাল বেলুন আরো একটু ফুলিয়ে নিয়ে বললে–আবহাওয়া তো দেখছি অবিকল পৃথিবীর আবহাওয়ার মতোই।

আমি বললাম–নতুন খবর কিছু নয়। আবহাওয়া পৃথিবীর মতো বলেই স্পেস স্যুট আর অক্সিজেন হেলমেট না পরে দাঁড়িয়ে আছি।

ভীমসেন বললে, একেবারে অবিকল অবশ্য নয়। একটু তফাৎ আছে।

কতখানি?

হাইড্রোজেন আছে তিন পারসেণ্ট বেশী।

অক্সিজেন?

চার পয়েণ্ট ছ' পারসেণ্ট কম।

আবহাওয়ার উপাদান এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দিলাম। বিচিত্র গ্রহে জীবন্ত প্রাণী এই ক'দিনে একটিও দেখিনি–দূরবীন কষে শেষ চেষ্টায় ছিলাম যদি দেখা যায়। জীবন্ত প্রাণীর নমুনা না নিয়ে যেতে পারলে বিশ্ব চিড়িয়াখানা গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবে আমার। আশ্চর্য গ্রহ বটে! সোনা ঘাস, চকলেট পাহাড়, হলুদ সূর্য সৌন্দর্য এখানে আকাশে বাতাসে–নেই কেবল সজীব প্রাণী।

তাই বিলক্ষণ মুষড়ে পড়েছিলাম শেষ চেষ্টা চালিয়েও।

বলেছিলাম, সবই তো আছে, হরেকরকমের ধাতু

আর খনিজ আছে, অদ্ভুত অদ্ভুত গাছপালা আছে–নেই খালি একটাও জ্যান্ত প্রাণী–পোকামাকড় পর্যন্ত নেই। কিমাশ্চর্যম!

এমন সময়ে হয়শিরার চিৎকার শোনা গেল পেছন থেকে– 'ভীমসেন! ঘটোৎকচ!'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ঘোড়ামুখো হয়শিরা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে আসছে আমাদের দিকে। ঘোড়ামুখো বলে সত্যি সত্যিই ওর মুখ ঘোড়ার মত নয়, তবে অতি বিদিকিচ্ছিরি মুখ। লম্বাটে, শ্রীহীন, অশ্ব-মস্তক বিশিষ্ট বলেই ওর নাম হয়শিরা।

হয়শিরার কাঁধে একটা সোনালী লোমশ জীব। পরম স্নেহে তার পিঠে হাত বোলাচ্ছে হয়শিরা। অবাক হলাম। জীবন্ত প্রাণীর দর্শন না পেয়ে মুষড়ে পড়েছিলাম বিলক্ষণ, এবার হলাম বিস্মিত–জীবন্ত প্রাণীকে হয়শিরার স্কন্ধে দেখে।

কাছে আসতে দেখি জীবটার বর্ণনা দেওয়াটাও কঠিন। বেড়ালও বলা চলে, খরগোশও বলা চলে। গিনিপিগের বৃহৎ সংস্করণও বলা চলে। গা বোঝাই সোনালী লোম–লম্বা লোম ঝুলছে শরীরের তলায়। চোখ দুটো রক্তবর্ণ–গোলাকার–ছোট ছোট দুটো চাকতির মতো। সবচেয়ে আশ্চর্য তার চার পায়ের আঙুল।

প্রতি পায়ে চারটে করে আঙুল–চারদিকে ছড়ানো। বিদঘুটে সেই গাছের আঙুলের মতো গাঁটযুক্ত!

পেলে কোথায়? শুধোই সবিস্ময়ে।

লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে, কিলবিল করছে চারদিকে, ঘাসের সঙ্গে গায়ের রঙ এমন ভাবে মিশে গেছে দূর থেকে বাইনোকুলোর দিয়েও দেখতে পাবে না।

অদৃশ্যই তো ছিল এতক্ষণ?

হঠাৎ চোখে পড়ে গেল, ঘটোৎকচ। তোমার কথা ভেবেই ধরে নিয়ে এলাম–এর মধ্যেই কিন্তু ভারি পোষ মেনে গেছে।

তা ঠিক। হয়শিরার কাঁধে বসে লাল-লাল ভাঁটা চোখ মেলে ইতিউতি তাকাচ্ছে মজার জীবটা। পালাবার কোনো চেষ্টাই নেই। ষোলটা বিটকেল আঙুল দিয়ে শার্ট খামচে ধরে বসে আছে পরম আয়াসে।

মজারু নামটা মাথায় এসে গেল হঠাৎ।

বললাম, ওর নাম হোক মজারু, কি বলো?

ভীমসেন আর হয়শিরা তো হেসে কুটিপাটি মজারু নাম শুনে। তখন কি ছাই কল্পনাও করতে পেরেছিলাম, মজাদার মজারু শেষপর্যন্ত মজা বার করে ছাড়বে আমাদের? প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলবে ভয়ংকর লোমহর্ষক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে?

যাই হোক, ছোট্ট হলুদ গ্রহে আর যা কিছু দেখবার, যা সব নিয়ে তদন্ত করার দরকার ছিল, সব সাঙ্গ করার পর রকেট নিয়ে রওনা হলাম পৃথিবীর দিকে।

ছোট্ট রকেট। কন্ট্রোল কেবিনের মধ্যেই সাজিয়ে রেখেছিলাম কিছু নমুনা। মঙ্গলগ্রহ আর বৃহস্পতি-গ্রহের মধ্যেকার ও ফাঁকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ক্ষুদ্রে গ্রহ বা অ্যাসটরয়েডের দুটি থেকে সংগ্রহ করেছিলাম এমন দুটি আকরিক ধাতু, যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লাল রঙের ধাতু–সাধারণ তাপ মাত্রায় নরম তলতলে–

কিন্তু একটু গরম পেলেই এমন কি রোদের আঁচেও শক্ত হয়ে যায়। তারপাশেই টেবিলের ওপর সবুজ প্লাস্টোগ্লাস টবে পুঁতে রেখেছিলাম গাঁটযুক্ত চার আঙুলে ক্ষুদে রাক্ষসের মতো সেই সৃষ্টিছাড়া গাছটা।

রকেটে আমরা তিনজনই। আমি, ভীমসেন আর হয়শিরা। অনন্ত মহাশূন্যের তিন অভিযাত্রী। ভীমসেন রকেট ইঞ্জিন নিয়ে ব্যস্ত হয়শিরা কাঁধে মজারুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে তার পেছনে, আমি বসে আছি বিদঘুটে গাছটার সামনেই একটা টুলে।

ঘাড় ফিরিয়ে ফিক করে হেসে বললে ভীমসেন–'হয়শিরা, মজারু তো দেখছি দারুণ ন্যাওটা হয়ে পড়েছে তোমার। কাঁধ থেকে নামতেও চাইছে না। আরে বাবা, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

ভীমসেন এই রকেট-মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন। হয়শিরা তাই তাকে ক্যাপ্টেন বলেই ডাকে মনটা খুশী-খুশী থাকলে। বললে, ফলে আমার পোয়াবারো, ক্যাপ্টেন।

কেন?

পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পর আমার ঘাড় থেকে মজারু নামতে চাইবে না। বিশ্ব-চিড়িয়াখানাকে মোটা দাম দিতে হবে–তবে মজারুকে হাতছাড়া করব।

মাথা ভন্ডুল করে দেওয়ার মত ঘটনাগুলোর প্রথমটা ঘটল এই কথাবার্তার ঠিক দু'দিন পরে–পৃথিবীর হিসেবে অবশ্য দু'দিন।

মজারু এই দু'দিনে হয়শিরার কাঁধ থেকে নেমে ঘুর ঘুর করতে শুরু করেছে রকেটের সর্বত্র। চ্যাটালো চার আঙুলে ভর দিয়ে ওর চার পায়ে হাঁটা দেখলেও হাসি পায়।

হাসি বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চিৎকারে–আমার ঘড়ি-কম্পাস গেল কোথায়?

ঘড়ি-কম্পাস! সবিস্ময়ে ফিরে দাঁড়ালাম আমরা। মানুষ প্রাণী বলতে তো আমরা এই তিনজন–মজারু থপ থপ করে টহল দিচ্ছে মেঝেতে। ঘড়ি-কম্পাস তো থাকে বাদামী মেশিনের সঙ্গে লাগানো টেবিলের ওপর।

এই দেখলাম রয়েছে, এখন দেখি নেই! আবার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে ভীমসেন।

এক্ষুনি ছিল এখানে? এখন নেই? ভাবনায় পড়লাম আমি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ।এক মিনিটও হয়নি!

আমার তখন খেয়াল হল, কিছু কিছু জিনিস আমিও খুঁজে পাচ্ছি না। যেমন, ত্রি-মাত্রিক দাবা ছকের ঘুঁটিগুলো।

কথাটা বলছি ক্যাপ্টেনকে, এমন সময়ে আঁতকে উঠে বিকট চেঁচিয়ে উঠল ভীমসেন–হাত-গাছ! হাত-গাছ! হুঁশিয়ার!

বিষম চমকে ছিটকে গেছিলাম টুল থেকে। সড়াৎ করে দুটো রাক্ষুসে শাখা-হস্ত আঁকাবাঁকা আঙুল মেলে বিদ্যুৎ বেগে ধেয়ে গেল আমার কাঁধের ওপর দিয়ে।

সর্বনাশ! নিরীহগাছ ভেবে কন্ট্রোল কেবিনে ঠাঁই দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যার সামনে বসে রয়েছি–হামলা চালাচ্ছে সে আমার ওপরেই!

পরক্ষণেই বুঝলাম না, হাত গাছের আক্রোশ আমার ওপর নয়, আমার সামনেই ড্যাবডেবে লাল চোখ মেলে উৎকট গম্ভীর মুখে মজারু তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। অতীন্দ্রিয় শক্তি বলে তার অস্তিত্ব টের পেয়েছে হাত-গাছ–সড়াৎ করে বাড়িয়ে দিয়েছে দু'দুটো ময়াল সাপের চাইতেও করাল-আকৃতি দুটি শাখা-প্রত্যঙ্গ তার দিকেই।

আর একটু হলেই ক্যাঁক করে মজারুকে সাপটে ধরত রাক্ষুসে হাত দুটো–বেঁকে গেল কেবল হয়শিরার জন্যে।

চোখের পলক ফেলার আগেই হেঁট হয়ে মজারুকে দু'হাতে খামচে ধরে দূরে সরিয়ে আনল।

কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল কল্পনাতীত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে।

উৎকট-গম্ভীর মুখে নির্ভীক ভাবে হাত-গাছের তেড়াবেঁকা হাতের লটপটানি লক্ষ্য করছিল মজারু। হয়শিরা তাকে খপ করে তুলে ধরে ঝপ করে সরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রক্তবর্ণ অগ্নিচ্ছটা ঠিকরে বেরিয়ে এল তার মুখগহ্বর থেকে!

সে আগুনের রঙ মজারুর লাল চোখের মতোই ঘোর রক্তবর্ণ!

লাল আগুনের ঝলক আগ্নেয়াস্ত্রের ঝলকের মতো হাত-গাছের আগুয়ান দুই হাতের দিকে বর্ষিত হতেই সটাসট দুটো হাতই পাকসাট খেয়ে ঘড়ির স্প্রিংয়ের মতো কুন্ডলী পাকিয়ে সরে গেল বুনোওলের মতো কান্ডের চারপাশে!

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল তাই তিনজনেরই। স্প্যানিয়েল কুত্তার মতো লোমশদেহী মজারু ততক্ষণে

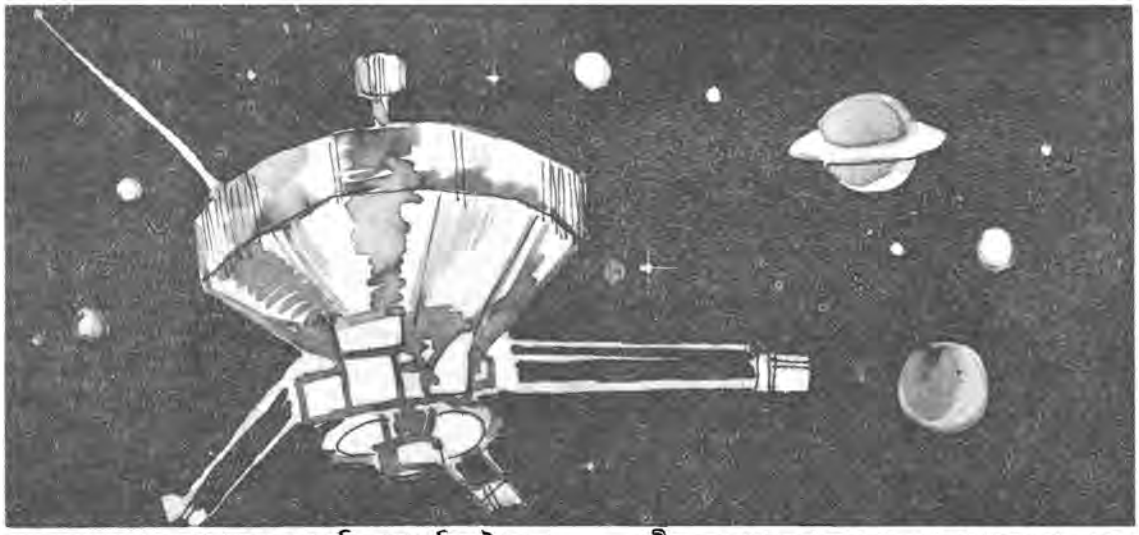

আবার ঘাড়ে চেপে বসেছে হয়শিরার। কিছুই যেন হয়নি–ভাবখানা এই রকম।

ঢোঁক গিলে বললে ভীমসেন–হয়শিরা, মজারুর প্রাণটা এ-যাত্রা তুমি বাঁচিয়ে দিলে, কি, হাল-গাছের প্রাণ বাঁচিয়ে দিলে-এই মুহূর্তে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে মজারু কিন্তু চিরজীবনের মতো কৃতজ্ঞ হয়ে রইল তোমার কাছে–।

ঝটতি বললাম আমি–সেই সঙ্গে নিখোঁজ জিনিসগুলোর রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গেল, সব ঐ হাত-গাছের কান্ড! শুঁড়-হাত বাড়িয়ে যা পেয়েছে নাগালের মধ্যে–সব পেটে পুরেছে।

পেট চিরে দেখব নাকি? ক্ষেপে গেল ক্যাপ্টেন।

পাগল! এমন দুর্লভ নমুনাটা পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে হবে না?

পৃথিবী বন্দর আর যখন মাত্র একদিনের পথ, হয়শিরা জ্বরে পড়ল। মহাকাশ ভ্রমণে যারা বেরোয়, অনেক কষ্টকর ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাদের। মহাকাশ-জ্বর তাদের অন্যতম। বেহুঁশ অবস্থায় বেচারীকে নিয়ে যেতে হল সবচেয়ে কাছের অ্যাসটেরয়েড হসপিটালে।

অ্যামবুলেন্স রকেটশিপ উধাও হল হয়শিরাকে নিয়ে হসপিটাল অভিমুখে। পোর্টহোল দিয়ে দেখলাম জোড়াপাখনায় রেডক্রশ আঁকা অ্যামবুলেন্স শিপ মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে।

নির্নিমেষে সেইদিকে চেয়ে থেকে বলেছিলাম–হয়শিরা, নির্ভয়ে থেকো। তোমার মজারুর তত্ত্বাবধান আমরা করব।

ভীমসেন ও সব ভাবালুতার ধার ধারে না। তার দৃষ্টি পথের বিপদ-আপদের দিকে। এমন কি স্পেসশিপের ভেতরকার নিরাপত্তার দিকেও খর নজর থাকে সর্বক্ষণ। হাজার হোক ক্যাপ্টেন তো।

তাই সম্বিত ফিরে এসেছিল তার অকস্মাৎ চিৎকারে– ঘটোৎকচ!

কি হল? চমকে তাকিয়েছিলাম তার দিকে।

অবিশ্বাস্য কান্ড!

বিস্ফারিত চোখে ভীমসেন তর্জনী তুলে যেদিকে দেখাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য কিছুই চোখে পড়ল না।

দম আটকানো স্বরে ফের বললে ভীমসেন টবটা....গাছের টবটা!

এবার দেখলাম। সবুজ টবটা আছে, প্লাস্টো-গ্লাসের সেই বাটির মতো সুদৃশ্য টব–যে টবে পুঁতে রেখেছিলাম কিম্ভূতকিমাকার হাত-গাছ।

গাছটা কিন্তু নেই!

বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে!

ভীমসেন তখন রুদ্ধশ্বাসে বলছে–দেখেছো? হাত-গাছ নেই!

আমতা আমতা করে বলেছিলাম–হয়শিরা যাওয়ার সময়ে নিয়ে যায় নি তো!

উঁহু। খালি হাতে উঠেছে অ্যামবুলেন্স রকেট-শিপে। তুমি দেখেছো।

তবে হয়তো কোন ফাঁকে খতম করে ফেলে দিয়েছে–মজারুর দিকে হাত বাড়ানোর শোধ

নিয়েছে।

তাই কি?

আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়। ও যখন থাকবে না, তখন যেন মজারু নিরাপদে থাকে, এই মতলবেই হয়তো শেষ করে দিয়েছে হাত-গাছকে।

ইতিউতি তাকাচ্ছিল ভীমসেন মজারুর সন্ধানে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল বিষম চিৎকার করে–ঘটোৎকচ! তুমি যা ভাবছ তা ভুল। ঐ দ্যাখো!

এবার সত্যিই আঁৎকে উঠলাম। ভয়ডর আমার মধ্যে একেবারেই নেই–আগেই বলেছি। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে যা দেখলাম, গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার।

কেবিনের এককোণে জবুথবু ভাবে চারপায়ের ষোল আঙুল মেঝেতে লেপ্টে নির্নিমেষে আমাদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে লোমশদেহী স্বর্ণবর্ণ মজারু।

এবং তার মাথার দুপাশে এতদিন যা দেখা যায়নি–এবার তা দেখা যাচ্ছে।

দুটি নতুন প্রত্যংগ!

হরিণের শাখাযুক্ত শৃংগ যেমনি থাকে, অথবা স্ট্যাগ গুবরে পোকার চোয়ালে যেমন শিং থাকে–রাতারাতি মজারুর মাথার দু-পাশে তেমনি একজোড়া ডালপালা মেলে ছড়িয়ে থাকা শিং গজিয়ে উঠেছে।

পরক্ষণেই খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে গা শিরশির করে উঠল আমার।

ভীমসেন লক্ষ্য করেছিল আগেই–তাই অমন পরিত্রাহি চিৎকার।

নিছক শিং নয়–চার আঙুলে ডালপালার দুটো হাত! সবুজ রঙের!

হাত-গাছের দশ/বারোটা গাঁটযুক্ত আঙুল সহ হাতের দুটো হাত ঠেলে উঠেছে মজারুর মাথার দু-পাশ দিয়ে।

ভীমসেন বললে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কানেরকাছে–এবার বুঝেছো হাত-গাছ গেছে কোথায়? মজারুর পেটে ঘড়ি-কম্পাস, তোমার ত্রিমাত্রিক দাবার ঘুঁটি–সব নিশ্চয় ঐ মজারুই গিলেছে। গিলতে গেছিল হাত-গাছকেও আমাদের সামনে–অত ভয় পেয়ে হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে গিয়েছিল বেচারা। নিজে প্রাণে বাঁচবার জন্যে।–মজারুকে প্রাণে মারবার জন্যে নয়।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ তো বটেই, ঘটোৎকচ! পৃথিবীতে এই জীবকে নিয়ে গিয়ে....

অনর্থ বাধিয়ে বসব না তো? মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলাম আমি।

দ্রুত চিন্তা করে নিলে ভীমসেন।

বললে–এসো একটা খাঁচা বানাই। এভাবে ওকে ছেড়ে রাখা সমীচীন নয়।

হাত লাগালাম দুজনেই। অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস দিয়ে লোহার ফ্রেম যখন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছি, তখন আর একবার পিলে-চমকানো চিৎকার করে উঠলো ভীমসেন–ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচ!

খাঁচা বানানো নিয়ে তন্ময় হয়েছিলাম বলে এতক্ষণ মজারুর দিকে তাকানোর অবসর পাইনি।

এবার তাকালাম এবং থ হয়ে গেলাম।

নিশ্চয় অস্মোসিস জাতীয় কোনো অত্যাশ্চর্য প্রক্রিয়া নিহিত রয়েছে আশ্চর্য প্রাণী মজারুর অণুপরমাণুতে। অস্মোসিন–সূক্ষ্মপদার্থ বিশেষের মধ্যে দিয়ে জল বা অপর কোনো দ্রাবক পদার্থের যে গতি লক্ষিত হয়–সেই অস্মোসিস! পর্দার ভেতর দিয়ে দ্রাবক তরল পদার্থটা নিঃসৃত হয়, কিন্তু পদার্থটা আটকে যায়। অসমান ঘনত্বের দুটি পদার্থের ঘনত্ব সমান করতে চায়। মজারুর রক্ত কি তাহলে হাইপারটনিক অবস্থায় আছে? জীব দেহের রক্ত স্বভাবতঃই হাইপারটনিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু এ কি রকমের জীব? একি অসম্ভব কান্ড করে চলেছে সে অস্মোটিক প্রেসারের ভেল্কি দেখিয়ে?

আগেই বলেছি দুটো অ্যাসটেরয়েড থেকে অদ্ভুত দুটো আকরিক ধাতু সংগ্রহ করে এনে রেখেছিলাম কন্ট্রোল কেবিনে। লোহিত বর্ণের বিচিত্র ধাতুপিন্ড দুটো স্বাভাবিক মাত্রায় নরম তলতলে–সামান্যতম উষ্ণতার ছোঁয়ায় কঠিন হয়ে ওঠে।

রহস্যময় মজারুর মাথার জোড়া হাত-শিং থেকে বিদ্যুৎ লহরীর মতো চিড়িক চিড়িক করে শক্তিবর্ষণ ঘটছে এই দুটি আকরিক ধাতুর দিকে এবং ব্যাদিত মুখ গহ্বরে গলিত স্রোতের আকারে ধাতু দুটি যাচ্ছে নিঃশব্দে–বিরামবিহীন ভাবে!

হাতের যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেল আমাদের বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে!

সর্বভুক মজারুর কিন্তু দৃকপাত নেই কোনো দিকে। জোড়া শিংয়ের আটটি আঙুল থেকে বিদ্যুৎ বর্ষণ অব্যাহত রইল, যতক্ষণ না দু'দুটো আকরিক ধাতুপিন্ড পুরোপুরি প্রবেশ করল তার শরীর গর্ভে–

তারপর ছোটখাট স্লেটের সাইজের রক্তবর্ণ জোড়া চোখ মেলে চাইল আমাদের পানে।

ভাবলেশহীন নিরীহ চক্ষু। হিংসা, জিঘাংসা, নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র নেই সেই চোখে। হিমশীতল নিষ্প্রাণ চোখের চাহনি।

কিন্তু অদৃশ্য শক্তি-তরংগ অনুভব করলাম সর্বদেহ দিয়ে।

সেই সংগে রোমাঞ্চিত কলেবরে লক্ষ্য করলাম আর একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন!

আকারে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে ভালোমানুষ মজারু!

পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে গায়ের রঙেও।

রক্তবর্ণ আকরিক ধাতুর রঙের আভাস লেগেছে হলুদ দেহে। হলুদ গা ফুটে ঝিলিক দিচ্ছে চাপা লোহিত দ্যুতি।

সবার ওপরে ঐ হাত-শিং সবুজ রঙের! হাত-গাছ যে সবুজদেহী ছিল।

খাবি খেতে খেতে বললে ভীমসেন–ঘটোৎকচ। আর দেরী নয়। কালকে পৃথিবীতে রকেট নামানোর আগেই হারামজাদাকে খাঁচায় পুরে ফেলা দরকার। এখুনি! এখুনি! এখুনি!

এখুনি বললেই কি আর এখুনি হয়–খাঁচাতো তখনো তৈরী হয়নি। আধা খ্যাঁচরা খাঁচায় ভয়াবহ শক্তির অধিকারী নিরীহ-দর্শন ঐ জীবটিকে ঢোকাই কি করে?

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভয়ের চোটে প্রাণ উড়ে গেল আমাদের দুজনেরই। ভয়ে ভয়ে মজারুর দিকে নজর রেখে কাজ করা কি যায়? শিউরে শিউরে উঠছি প্রতি মুহূর্তেই–না জানি আবার কি অনর্থ ঘটিয়ে বসে। পৃথিবীতে নামবার সময়ও এগিয়ে আসছে–খাঁচা শেষ করতে হবে তার আগেই। সর্বভুক ঐ কদাকার বিভীষিকাকে খাঁচার বাইরে রেখে পৃথিবীর মাটিতে নামানোর সাহস নেই কারোরই।

রকেটশিপ চালাবো, না খাঁচা তৈরী করবো? মজারুকে চোখে চোখে রাখব, না অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস দিয়ে স্টীল স্লেট জোড়া দেব? হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে, মনে জোর পাচ্ছি না....।

এরই মধ্যে কোন মতে খাঁচা তৈরী করে ফেললাম। পৃথিবীতে রকেট নামানোও হল। সিগন্যাল এসে গেল স্পেসশিপ পোর্ট কন্ট্রোল থেকে। এবার দোর খুলতে হবে–নমুনা-টমুনা নিয়ে নামতে হবে।

দুই মূর্তি ঘুরে দাঁড়ালাম মজারুর দিকে, খাঁচায় পুরে তবে অন্য কথা।

কিন্তু ও অলৌকিক ক্ষমতারও অধিকারী নাকি? মনের কথা টের পায়!

আমরা ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অ্যালসেসিয়ান কুকুরের আকারপ্রাপ্ত মজারু কিনা ফট্ করে বিদিগিচ্ছিরি হাত-শিং বাড়িয়ে ছিল আমাদের দিকে।

লম্বা লম্বা হাত দুটো যেন এতক্ষণ ঘড়ির স্প্রিংয়ের মতো কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় ছিল মাথার মধ্যে। ফুট দশেক লম্বা হয়ে গেল সবুজে রঙের গেছো শিং–এক এক জনের বুকে চারটে গাঁটযুক্ত আঙুল রেখে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে পেছন দিকে।

রাম ধাক্কা একেই বলে! ঐটুকু প্রাণীর গায়ে এত শক্তি! হাত-গাছের সমস্ত শক্তিটাই সংহত করে নিয়েছে, নিজের মধ্যে। যা কিছু শুষে নিচ্ছে তাদের সমস্ত স্বভাব প্রকৃতি শক্তি নিজের মধ্যেই আহরণ করে চলেছে। একি বিটকেল প্রাণীর পাল্লায় পড়লাম রে বাবা!

ধাক্কা খেয়ে পেছনে ঠিকরে গিয়েও তাই প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম–ভীমসেন! ক্যাপ্টেন! স্পেসডোর লক করে রাখো!

কিন্তু বৃথা! বৃথা! বৃথাই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলাম। দরজা বন্ধ করে মজারুকে বন্দী করে রাখতে পারি নি। কি বিপর্যয় কান্ড যে ঘটিয়ে বসল হতচ্ছাড়া বেল্লিক মজারু, তা কি করে ব্যক্ত করি ভেবে পাচ্ছি না।

ধাতু পর্যন্ত যে শুষে মেরে দেয়, স্পেসশিপের দরজায় তালা দিয়ে তাকে আটকানো যায়?

যায় না। মজারুকেও আটকানো যায় নি।

থপথপ করে পাজি বেইমানটা মজবুত দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিলবিলে ভূতুড়ে আঙুলগুলো কংকালের হাতের মতো তুলে ধরে অজ্ঞাত সেই বিদ্যুৎ-রশ্মি বর্ষণ করে গেল দরজার অতি-মজবুত সংকর ধাতুর প্লেটের ওপর।

আমাদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনেই গলে গলে খসে পড়ল দরজা।

বৃহৎ ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল সবুজ পৃথিবী, নীল আকাশ, স্পেসপোর্ট, স্পেসওয়েতে দন্ডায়মান বিমূঢ় অপারেটরদের!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমরা দু'জনও।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই মজারু-বজ্জাতটার। রক্তাভ হলুদ বিশাল গতরটা গলিয়ে নিয়ে গেল ফোকরের মধ্যে দিয়ে। যেন হাওয়া খেতে যাচ্ছে নতুন দেশে, এমনি নির্বিকার ভাবে নেমে গেল নিচে। সামনে যা পেল, তাই বিদ্যুৎ রশ্মি বর্ষণ করে গালিয়ে অবলীলাক্রমে শুষে নিতে লাগল বেধড়ক বৃহৎ অবয়বের মধ্যে।

এমন কি বিশ্বব্রহ্মান্ডের কঠিন ধাতু এভারডুরা দিয়ে নির্মিত ভূ-গোলক স্কন্ধে নতজানু হারকিউলিসের মূর্তিটাকেও বাদ দিল না।

কিন্তু যা কিছু করছে, সবই অতিশয় নির্বিকার ভাবে। মুনিসুলভ তাপসিক মূর্তি। লম্বা লম্বা চুল আর উৎকট গম্ভীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষি। হাজার হাজার বছর তপস্যা করার ফলে যাদের নাকি চুলদাড়ি কামানের সময় হত না–কিন্তু অলৌকিক শক্তি অর্জন করত, তবে সে সব উদ্ভট কাহিনী অলীক পৌরাণিক কাহিনীতেই মানায়, পড়তেও মন্দ লাগে না–মজারুকে দেখে মজা-ফজা উড়ে গেল মন থেকে।

হট্টগোলের খবর পেয়ে টহলদার সশস্ত্র বাহিনী যখন এসে পৌছোলো, তখন লোমশ ভালুকের আকার আয়তন নিয়ে থপথপ করে মজারু চলেছে নতুন আহারের সন্ধানে।

পেছন থেকে ক্র্যাক্-ক্র্যাক্ শব্দে অগ্নিবর্ষণ ঘটিয়ে চলল সশস্ত্র বাহিনী। কিন্তু নির্ভুল লক্ষ্যে অস্ত্রাঘাত করেও যে তার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত কাটা যাচ্ছে না।

চামড়া যেন এভারডুরা দিয়ে তৈরী। মন্তব্যে করেছিল একজন কপালে চোখ তুলে।

তা তো হবেই, জবাব দিয়েছিলাম আমি। এভারডুরা শুষে নিয়েছে যে। এভারডুরার সমস্ত ধর্ম এখন ওর মধ্যেও এসে গেছে। গুলিগোলা রশ্মিবর্ষণ করেও ওকে এখন ঘায়েল করা যাবে না।

সর্বনাশ! তাহলে এখন উপায়?

আর্মি কমান্ডার অটল স্বরে বললে–দেখাই যাক না। আনাও কামান–দেখা যাক গোলার ঘায়ে টুকরো টুকরো হয় কিনা শয়তানের বাচ্চা!

হেভি আর্টিলারী যখন এসে পৌছোলো, তখন দেরী হয়ে গেছে খুবই।

মহাকাশ বন্দরের আকাশচুম্বী বিরাট জটিল মূল্যবান কলকব্জার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মজারু। সারা গা থেকে রক্তাভ দ্যুতি ছিটকে বেরোচ্ছে–রক্তলাল আকরিক ধাতুর দ্যুতি-হাত-শিং থেকে কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে অশনি-নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে মুহুর্মুহু!

কমান্ডার ভদ্রলোক গোঁয়ার নয়। এ অবস্থায় কামান থেকে গোলা বর্ষণ করলে ঠিকরে গিয়ে দামী দামী কলকব্জার যে বারোটা, তা বুঝতে পেরে থামিয়ে দিলে গোলন্দাজদের। তাছাড়া অদূরেই রয়েছে শহরের কেন্দ্রস্থল খানদানী চৌরংগীপাড়া। কান্ড বেধে যাবে এখানে গোলাবর্ষণ শুরু হলে।

ফাঁদে পড়েছি সবাই। মুস্কিল আসান করা যায় কি করে?

মজারুর চেহারা এবার ম্যামথ হাতীর মতো প্রকান্ড হয়ে উঠছে। লোম ঝুলছে সারা দেহে। পেছনের দু'পায়ের আট আঙুলে ভর দিয়ে দৈত্যকার

বপু খাড়া করে, সামনের দু' পায়ের আট আঙুল সামনে বাড়িয়ে ধরে সারা শরীর থেকে রক্তলাল বিধ্বংসী রশ্মি বর্ষণ করে চলেছে সব কিছুর ওপর। প্রলয় সৃষ্টি করে চলেছে অবলীলাক্রমে। মড়মড় করে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে–মহাপ্রলয়ের মাঝে নির্বিকার দেহে দাঁড়িয়ে প্রলয়দেবতার মতো নির্বিকার মজারু সর্বঅংগ দিয়ে শোষণ করে নিচ্ছে সব কিছু।

রাক্ষস! সাক্ষাৎ দানব! হলুদ গ্রহে ছোট্ট মজার সেই প্রাণী দেখে কি কুক্ষণেই নাম দিয়েছিলাম মজারু। বিড়বিড় করে বলেছিলাম আমি মহাপ্রলয় দেখে। দৌড়েছিলাম হেডকোয়ার্টার অভিমুখে।

পৃথিবীর সবকটা মহাকাশ বন্দরের মধ্যে কলকাতা মহাকাশ বন্দরের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। শহরের ঠিক মাঝখানে এতবড় ময়দান আর পাবে কোথায়? ফোর্ট উইলিয়ামও কাছে। বিশাল কলকাতা শহর ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূরে–বৃটিশদের পত্তন করা আদি কলকাতা এখনো খানদানী কলকাতাই রয়ে গেছে–পুরোনো দিল্লির মতো নোংরা ঘিঞ্জি হয়ে যায়নি–অনেকগুলো উপনগরী গজিয়ে উঠেছে আদি কলকাতার চারপাশে। বৃটিশ আমলের সেই কলকাতাও এখন আর নেই। রাস্তাঘাট চার-পাঁচ গুণ বেশী চওড়া। চলমান ফুটপাত দিয়ে এখন আর কাউকে হাঁটতে হয় না–উঠে দাঁড়িয়ে থাকলেই হল। ফুটপাতই তোমায় টেনে নিয়ে যাবে যেখানে যেতে চাও। ট্রামগাড়ী এখনো আছে–ওটা নাকি কলকাতার ঐতিহ্য–তবে মাথার ওপর দিয়ে ঝুলন্ত রেলগাড়ী চলে বিদ্যুৎবেগে–রেলগাড়ী ছোটে পাতাল-সুড়ংগ দিয়েও।

এহেন জমজমাট শহরের দিকেই থপ থপ করে অতিকায় মজারু অগ্রসর হচ্ছে দেখে পড়ি কি মরি করে দৌড়েছিলাম ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে। ময়দানের মাঝখানকার স্পেস-পোর্ট থেকে খুব কাছেই তো।

চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই শুনলাম, জাঁদরেল দুই অফিসারের কথাবার্তা। দেওয়ালে টাঙানো কলকাতার ম্যাপের দিকে আঙুল তুলে বলছে একজন আর একজনকে–শহর থেকে লোকজন যদি এখন সরিয়ে দেওয়া যায়–

কিন্তু–অপরজনের কিন্তুর পরের কথাটা থামিয়ে দিলাম আমি পেছন থেকে।

বললাম হাঁপাতে হাঁপাতে, খবরদার! ও কাজটি করতে যাবেন না।

ঘুরে দাঁড়াল দুই অফিসার। ভুরু কুঁচকে দেখে নিল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। জানি তো এবার ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করবে–কে মশাই আপনি? জ্ঞান দিতে এসেছেন আমাদের?

তাই সাততাড়াতাড়ি পরিচয় দিলাম আমার। বললাম–কলকাতা খালি করার দরকার কী? আমার প্ল্যানটা যদি শোনেন–

থুতনিতে টোকা দিতে দিতে গম্ভীর চালে বললে একজন–মহাশয়ের প্ল্যানটা যদি জানতে পারি....

ব্যক্ত করলাম আমার প্ল্যান। অতি সংক্ষেপে। হয়শিরার বড় ন্যাওটা ঐ বেইমান মজারু। আকার আয়তনে ম্যামথকেও এখন হার মানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু হয়শিরাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে মনে হয় না। তাকে যদি আনানো যায়, মজারু তার হুকুম

মানবেই।

দুই অফিসারের দেখলাম দু'রকমের মুদ্রাদোষ। একজন থুতনিতে টোকা দেয় বুদ্ধি গুলিয়ে গেলে, আর একজন নিজেই নিজের কান ধরে টানতে থাকে। হাস্যকর মুদ্রাদোষ নিঃসন্দেহে। কিন্তু তখন হাসবার মতো সময় তো নয়।

কান ধরে টানতে টানতে অফিসারটি দ্বিরুক্তি না করে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়ে দিলে, হয়শিরাকে স্পেসশিপ করে এখুনি আনা হোক অ্যাসটেরয়েড হাসপাতাল থেকে।

যথাসময়ে এসে গেল হয়শিরা। ঘোড়ামুখে দন্ত বিকশিত করে বললে, ভয় কি? আমি যখন এসে গেছি, বিহিত একটা হবেই।

হবে তো বোঝা গেল, কিন্তু কবে হবে? কিভাবে হবে? মজারু তো টিলার মতো বড় হয়ে গেছে এতক্ষণে। ত্রিবর্ণরঞ্জিত বিশালকায় প্রাণীটাকে দেখে কে বলবে এই সেই ছোট টুকটুকে হলদে জীব। লাল ধাতু শুষে নেওয়ার ফলে গায়ের পেছন দিককার লোম লাল, সবুজ হাত-গাছের দৌলতে দাড়ির মতো ঝোলা লোমগুলো সবুজ আর ঘাড়ের দু'পাশে হলুদ লোম। সে এক কিম্ভূতকিমাকার তে-রঙাপ্রাণী। চলন্ত পতাকা বলা চলে। চলন্ত এবং জীবন্ত। মাথার ওপর কিলবিল করছে চার-আঙুলে সেই দুটি হাত-গাছের শিং!

পায়ের আঙুল চারটেও ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত। ফ্লাই-ওভার পেরিয়ে যখন সে পৌঁছেছে হাওড়া ব্রীজের কাছে, হয়শিরা দন্ত বিকাশ করে দাঁড়াল তার সামনে।

আমি রইলাম হয়শিরার পাশে।

আমার দিকে চেয়েও দেখল না অকৃতজ্ঞ মজারু–অথচ তার নামকরণ করেছি আমিই।

বারকোশের মতো বিরাট গোলাকার লাল চোখ মেলে ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে রইল হয়শিরার পানে।

যাক্, তাহলে চিনতে পেরেছে হয়শিরাকে!

বললাম ফিসফিস করে–চিনতে যখন পেরেছে, তখন চটপট বলো দিকি আপদ বিদায় করবে কি করে।

মুচকি হেসে হয়শিরা বললে–হলুদ গ্রহে আর স্পেসশিপে তো দেখেছো, আমি যা করাতে চাই ওকে দিয়ে–সঙ্গে সঙ্গে তা করে। অবাধ্য হয় না।

তা দেখেছি বলেই তো–

এবারও তাই করাবো।

কিভাবে? কিভাবে?

আবার ফিক করে হাসলো হয়শিরা। হাসিটা যেন কেমনতর ঠেকালো আমার।

বললে–দেখোই না কি করি।

এর বেশী আর কিছু ভাঙলো না হয়শিরা। হতভম্ব হয়ে চললাম ওর পেছন পেছন। আমাদের পেছনে অতবড় হাওড়া ব্রীজ পদভারে কম্পিত করে এল মজারু। সেকি গুম্ গুম্ আওয়াজ। নাটবল্টুগুলো পর্যন্ত আর্তনাদ করে উঠল অতিকায়ের পায়ের আর দেহের চাপে। এত বছরের পুরোনো ব্রীজ–ভেঙে না পড়ে!

ব্রীজ পেরিয়ে হাওড়ায় ঢুকলো হয়শিরা–পেছনে মজারু।

খুঁজে খুঁজে বার করল একটা কাচের কারখানা। অভঙ্গুর কাচের কারখানা। সটান ভেতরে ঢুকে গেল হয়শিরা। মজারুও গেল থপথপ করে। তারপরেই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল কারখানার মধ্যে, বোতল জার বয়েম চুরমার হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল তার বিদ্যুৎ বর্ষণের সামনে–নীল কাচ যেন বাষ্পের আকারে শোষিত হল সর্বাঙ্গে। ফলে গায়ের কিছু লোম হয়ে গেল নীল রঙের।

মজারু এখন আর তিন রঙা নয়–চার রঙা। লাল, নীল, সবুজ, হলদে।

আমরা বিমূঢ়। হয়শিরার প্ল্যানটা কি, আঁচ করতে পারলাম না কেউই।

কাচের কারখানা থেকে হয়শিরা মজারুকে নিয়ে গেল আন্তঃগ্রহ বোটানিকাল গার্ডেনে। শিবপুরের সেই বোটানিকাল গার্ডেন–এখন সেখানে বিভিন্ন গ্রহ থেকে অদ্ভুত গাছপালা এনে পোঁতা হয়েছে।

মজারু এখন আয়তনে দোতলা বাড়ীর সমান।

দাঁড়ালো একটা মঙ্গলগ্রহ থেকে আনা শজারু গাছের সামনে। সবুজ গাছ। ডালপালাগুলো হুবহু শজারুর কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা–যেন সারি সারি বল্লম। মজারুর হাত-শিং থেকে যখন বিদ্যুৎ বহ্নি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল দুষ্প্রাপ্য সেই গাছটার ওপরেই। যখন দেখলাম শজারু-কাঁটা বল্লমগুলো মজারুর সারা গায়ে দাঁড়িয়ে গেল অজস্র বর্শা ফলকের মতোই, তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

বললাম, হয়শিরা, অমন গাছটাকেও মজারুর শরীরে চালান করছো? কিন্তু কেন? কেন?

দেখতেই পাবে–সংক্ষিপ্ত জবাব হয়শিরার।

দেখতে পেলাম সত্যিই। একের পর এক অনেক

কিছু দেখে গেলাম। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো অনেক অর্থহীন কান্ডকারখানা চালিয়ে গেল হয়শিরা তার মজারুকে দিয়ে।

অর্থহীন! তখন অন্তত তাই মনে হয়েছিল। পরে বুঝেছিলাম, হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম, অর্থ ছিল প্রতিটি উদ্ভট ক্রিয়াকর্মের–নিহিত ছিল একটা সুস্পষ্ট মতলব।

একটা অভিসন্ধি।

কিন্তু সেই গোপন অভিসন্ধির তিলমাত্র টের পাইনি ঘটনার পর ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হানা দেওয়ার সময়ে, কাচের কারখানা, শজারু-গাছ বুভুক্ষু মজারুর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার প্রকোপে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর নীলকান্ত মণির মতো ঝলমলে হয়ে উঠেছিল মজারু। হাজির হয়েছিল বিশাল একটা পারদ পাত্রের সামনে। টলটলে পারায় ভর্তি বিশাল গামলা, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় মারকারি বা কুইন সিলভার। থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, ম্যানোমিটার, মারকারি ভেপার লাইট এবং বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের সুবিশাল সেই কারখানা তছনছ করে দিয়েছিল মজারু একাই। জলের চেয়ে চোদ্দগুণ ভারি, তরল জীবন্ত রূপোর মতো অতীব উজ্জ্বল সেই ধাতু বাষ্পাকারে কয়েক মিনিটের মধ্যে উধাও হয়েছিল মজারুর অবয়বের মধ্যে।

তখনও বুঝি নি পারা দিয়ে মজারুর অণু-পরমাণুর মধ্যে কি ধরনের শক্তি ঠেসে দেওয়া হল। বুঝতে পারেনি সেনাবাহিনীর কেউই।

পারা-ভক্ষণের পর আরো দুটো নতুন প্রত্যংগ আবির্ভূত হল মজারুর যুগল-শিং-য়ের দু'পাশে। লিকলিকে চাবুকের মত সুদীর্ঘ রজতশুভ্র দুটি শুঁড়।

বারবার প্রশ্ন করেছিলাম বিমূঢ়ভাবে–পারা ঠাসানো হল কেন চলমান বিভীষিকার অণু-পরমাণুর মধ্যে? দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে একই ভাবে জবাব দিয়েছিল হয়শিরা–সবুর। সবুর। দেখতে পাবে এখুনি।

কিন্তু হয়শিরা, জানোয়ারটা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। চলমান পাহাড় বললেও চলে এখন। আরও কদাকার–হৃৎকম্প ঘটিয়ে ছাড়ছে প্রত্যেকের। বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে কল্পনাতীত ঐ ভয়াবহ আকৃতি দেখে। ঐ সব গিলিয়ে কিভাবে এই আপদ বিদেয় করবে বুঝতে তো পারছি না।

বলছি তো বুঝবে একটু পরেই।

মিনিট কয়েক পরেই হয়শিরার অসম্ভব পরিকল্পনা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো খেলে গেল আমার মস্তিষ্ক কোষগুলোর মধ্যে। কেন যে ঐ বিকট দর্শন প্রাণীটার রন্ধ্রে কাচ, পারা, কাঁটা ঢোকানো হয়েছে–তা উপলব্ধি করলাম মর্মে মর্মে।

বিশ্বব্যাংকের সামনেই মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার। সোনায় ঠাসা এ ব্যাংক ভূ-গোলকের মধ্যে আমেরিকার 'ফোর্টনক্স'–কেও এখন ম্লান করে দিয়েছে। এত সোনা সেখানেও নেই। তাল তাল সোনা, সোনার বাটের পাহাড়, সোনার অজস্র মূর্তি গ্রহ-গ্রহান্তর থেকে সংগ্রহ করে সঞ্চিত করা হয়েছে এই গোল্ড ব্যাংকে।

বিপুল এই স্বর্ণভাণ্ডারের বিশাল ইমারত তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়ল মজারুর মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ বর্ষণে। তারপর....

তারপর সোনাস্রোত জ্বলন্ত লাভাস্রোতের মতো উদরে ঢুকিয়ে নিতে লাগল মজারু–বিরাট বিকট শরীরের লক্ষ রন্ধ্র দিয়ে।

স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম আমি।

সোনা! সোনা গিলিয়ে মজারু-আপদকে বিদেয় করতে চায় হয়শিরা। কিন্তু কিভাবে?

সম্বিৎ ফিরেছিল হয়শিরার ঘোড়া-মুখের অট্ট-হাসিতে–মূর্খ ঘটোৎকচ, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হতে চলেছি আমি–সহায় এই মজারু। বিশ্বের কোনো শক্তি নেই আমার পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেওয়ার।

আমার আছে। সুপ্ত বিক্রম নিমেষ মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল আমার শিরা-উপশিরায়, আমি ঘটোৎকচ, গ্রহেগ্রহে ত্রাস সৃষ্টি করে ঘটোৎকচ খেতাব অকারণে অর্জন করিনি, চোখের পলক ফেলবার আগেই হোলস্টার থেকে ব্লাস্টার বার করে রশ্মিবর্ষণ করেছিলাম....

না, মজারুর দিকে নয়–

হয়শিরার দিকে।

কিন্তু আমার চাইতেও লক্ষ গুণ ক্ষিপ্র মজারু তার আগেই লিকলিকে শুঁড় থেকে অভংগুর কাচ ছড়িয়ে কাচের আবরণ সৃষ্টি করে ফেলেছে হয়শিরাকে ঘিরে। নীল কাচের বেলজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে পৈশাচিক অট্টহাসি হেসেই চলেছে কুচক্রী হয়শিরা। এ কাচ বন্দুকের বুলেটকে প্রতিহত করে–রশ্মি বন্দুকের রশ্মি ঠিকরে গেল মসৃণ গাত্র থেকে।

বুঝলাম.... এবার বুঝলাম, কেন অভংগুর কাচ গেলানো হয়েছিল মজারুকে।

তারও কিছুক্ষণ পরে সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝলাম, কুচুটে হয়শিরা অন্যান্য বস্তুগুলোও কেন ঢুকিয়েছিল মজারুর মধ্যে।

ঝাঁকে ঝাঁকে তেড়ে এসেছিল অটোমেটিক পাইলট স্লেন বিনাশ করার সুকঠিন সংকল্প নিয়ে। কিন্তু লিকলিকে পারদ শুঁড় দুটি আকাশে ধেয়ে গিয়েছিল চক্ষের নিমেষে–এক-একটা শুঁড় দিয়ে সাপটে এক-একটা বিমানকে আছড়ে ফেলেছিল ধরাতলে।

পারার মহিমা দেখেছিলাম স্বচক্ষে। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে থাকা হিংগুল থেকে যে পারাকে নিষ্কাশন করা হয়েছে অনেক মেহনত করে, যার চেয়ে গুরুতর আর কোনো তরল পদার্থ সাধারণ উষ্ণতায় থাকে না, উজ্জ্বল রজতশুভ্র যে ধাতু বায়ুর সংস্পর্শেও রজতের মতো মলিন হয় না, অমলিন ভাস্বর যে ধাতু অধিকাংশ অপর ধাতুকে দ্রবীভূত করে বলে তামা, অ্যালুমিনিয়াম বা রূপোর পাত্রে রাখা হয় না–সেই পারা স্রোত ধেয়ে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম সংকর ধাতু নির্মিত বিমান পোতগুলোকে গলিয়ে তালগোল পাকিয়ে আছড়ে ফেলতে লাগল মেদিনীর ওপর।

কানের কাছে অব্যাহত রয়েছে কিন্তু হয়শিরার বীভৎস অট্টহাসি আর বিকট উল্লাস–ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখন থেকে আমার মুঠোয়। তন্ত্র, মন্ত্র, অ্যালকেমির যুগ থেকে আজকের পারমাণবিক যুগেও যে চেষ্টা চলছে–একা মজারু এখন তা করে দেবে আমার জন্যে পারার পরমাণুক্রমাংক তো ৮০, সোনা পরমাণুক্রমাংক ৭৯–মৌলদের পর্যায়ে সারণীতে পারার স্থান তাই সোনার ঠিক পরেই। যুগপৎ সোনা আর পারা শরীর ঢুকিয়ে মজারু তফাৎটা ধরে ফেলেছে। এখন পারার পরমাণুতে একটা প্রেটনকণা কমাতে পারলেই তা সোনার পরমাণু হয়ে যাবে, বন্ধু! অসাধ্যসাধন করবে আমার মজারু। ইউনানের আকরিক হিংগুল থেকে বেরিয়ে আসবে সোনা–গান্ধারকে মুড়ে দেব সোনায়–গ্রহ-গ্রহান্তর থেকে সোনা সংগ্রহ চালিয়ে যাব আকরিক পারদ-গন্ধকের যৌগ থেকে।

হয়শিরার অট্টহাসি চাপা পড়ে গেল ক্ষেপণাস্ত্রের কর্ণবধিরকারী বিস্ফোরণে। মরিয়া সেনাবাহিনী সরাসরি মিসাইল ছুঁড়তে আরম্ভ করছে পর্বতাকার বিভীষিকাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু মজারুকে অপরাজেয় অবধ্য করে গড়ে তুলছে ক্ষমতা লোভী হয়শিরা তিল তিল করে আমাদের চোখের সামনেই–তার নমুনা প্রত্যক্ষ করলাম তখন। হৃৎপিন্ড স্থির হয়ে এল প্রত্যেকেরই।

এবার শুধু পারা-মাহাত্ম্য নয়–যুগপৎ দেখা গেল শজারু কাঁটার মহিমাও।

কার্তুজে পারার ব্যবহার আছে বিস্ফোরক বা ডিটোনেটর হিসাবে। মংগলগ্রহের দানবিক শজারু কাঁটার প্রতিটায় এই বিস্ফোরক ঠেসে পাল্টা মিসাইল নিক্ষেপ করতে শুধু করেছে মজারু। ক্ষেপণাস্ত্র উড়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে–ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যান্টি মিসাইল ধেয়ে গিয়ে শূন্যপথেই বিস্ফোরণ ঘাটাচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র-

গুলোর।

সারা কলকাতা, হাওড়া এবং বহুমাইল পর্যন্ত অঞ্চল থরথর করে কাঁপছে ঘন ঘন বিস্ফোরণ নিনাদে।

অজেয় মজারু। অবধ্য মজারু। বিশ্বপ্রভু হওয়ার স্বপ্ন-পাগল হয়শিরার পোষা বিভীষিকা মজারু অটল-গাম্ভীর্যে এবার থপথপ করে ধীরে স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে এল সেনাবাহিনীর দিকে।

হতচকিত সেনাবাহিনী, ভয়ার্ত আতংক-বিহ্বল সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে চম্পট দিচ্ছে যেদিকে পারে। সব অস্ত্রই বিফলে গেছে, এখন পলায়ন ছাড়া আর উপায় তো নেই।

আমি কিন্তু হার মানব না....কিছুতেই না। আমি ঘটোৎকচ। বাহুবলে শুধু নয়-বুদ্ধিবলেও আমি সেরা অভিযাত্রী। বহু মহাকাশ অভিযানে বেরিয়ে বারংবার তা প্রমাণ করেছি বহু গ্রহে.... ছোট্ট হলুদ গ্রহ থেকে আমদানী মজাদার মজারুকে ঘায়েল করতে পারবো না-এ হতেই পারে না।

মনোবল তাই আমার অটুট। ক্ষিপ্রচিন্তা চলছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। তারই মাঝে শুনলাম হয়শিরার ঘোটক-হাস্য।

ঘটোৎকচ, প্রথমেই কলকাতা দখল করব-তারপর একে একে বাকি শহরগুলো। খবর দাও শাসন অধিকর্তাকে-দু'ঘন্টার মধ্যে যেন পুরো কলকাতা খালি হয়ে যায়।

শহর খালি করতে হবে! সুপ্রাচীন ঐতিহাময় কলকাতা নগরী মজারুর লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে।

রুখে দাঁড়াল পলায়মান সেনাবাহিনী। জান যায় যাক, কর্তব্য সবার আগে।

রুখে দাঁড়ালাম আমিও। অকস্মাৎ।

মজারু বা হয়শিরার দিকে নয়-সেনাবাহিনীর দিকে।

গলার শির তুলে বললাম, খবরদার! আর প্রাণক্ষয় নয়-যুদ্ধ থামাও।

হয়শিরার উন্মত্ত অট্টহাসি ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলে মিলিয়ে গেল দূরে।

সেনাবাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

আমি বললাম-হয়শিরা, কলকাতা তোমার দখলেই যাক-কিন্তু কলকাতাবাসীদের তাড়িও না-তারাও থাকুক-কয়েকশ বছরের পুরনো এই শহর ছেড়ে তারা কোথায় যাবে বলো?

হয়শিরা আর একবার উন্মত্ত অট্টহাসি হেসে জবাব দিতে যাওয়ার আগেই বললাম-শহরের শাসন ক্ষমতা তোমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে একটা অনুষ্ঠান তো দরকার।

অনুষ্ঠান? ভুরু কুঁচকে গেল হয়শিরার-মন্দ বলোনি।

তাহলে এসো মজারুকে নিয়ে-তোমার বডিগার্ড নিয়ে আমাদের সংগে যেতে তো তোমার ভয় পাওয়ার কথা নয়?

ভয়? ভয় আবার কাকে? আবার সেই উন্মত্ত অট্টহাসি।

উন্মাদই হয়ে গিয়েছে হয়শিরা। মহাকাশের অসুখ পুরোপুরি সারেনি-হাসপাতাল থেকে টেনে আনার ফলেই তো এই অবস্থা। জ্বরের সব ক'টা লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। এই ভয়েই স্পেসশিপ থেকে তাকে তাড়াতাড়ি সরানো হয়েছিল-পৃথিবী পর্যন্ত আনা হয়নি। মজারুর উৎপাতে বিপর্যস্ত হয়ে আমার মতলবেই তাকে আনা হয়েছিল রোগ উপশম হওয়ার আগেই।

সুতরাং বিহিতও করব আমি।

শাসনক্ষমতা অর্পিত হবে কোনখানে, তা আগেই ভেবে রেখেছিলাম। আর একটা কারখানার মধ্যে। স্টীল আলমারী তৈরীর কারখানা। ছিটিং চেম্বারটা বিশাল হলঘরের মতো। আগাগোড়া নিশ্ছিদ্র পাত দিয়ে মোড়া।

মজারু আর হয়শিরাকে ঢোকানো হল তার মধ্যে। বন্ধ করে দেওয়া হল প্রবেশ পথ পর মুহূর্তেই।

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে তা দেখল হয়শিরা।

বললে দাঁতে দাঁত পিষে-মূর্খ! তালা দিয়ে রাখবে

আমাকে? বলেই আবার সেই অট্টহাসি।

অট্টহাসি কিন্তু মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। দম আটকে এল হয়শিরার।

ভয়াবহ পরিবর্তনগুলো আবার শুরু হয়ে গিয়েছে–এবার উল্টোদিক থেকে। পারা, সোনা, কাঁটা, কাচ–সব কিছুই ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ শিহরণ ঘটিয়ে বেরিয়ে আসছে মজারুর সর্ব অংগ থেকে। সেই সংগে দ্রুত ছোট হয়ে আসছে তার বিপুল অবয়ব! মিলিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য সব রঙ।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল বিস্ময়কর এই পরিবতন। ঘড়ি-কম্পাস, হাত-গাছ, ত্রিমাত্রিক দবার ঘুঁটি পর্যন্ত ঠিকরে পড়ল মাটিতে। এভারড্রা দিয়ে গড়া হারকিউলিস মূর্তিটাও বাদ গেল না!

ছোট, লোমশ মজারু–হলুদ গ্রহের মজাদার সেই মজারু–জ্বল জ্বল করে লাল চোখ মেলে হলুদ দেহ নিয়ে লম্বা লোম ঝুলিয়ে, চার পায়ে দাঁড়িয়ে রইল মেঝেতে। এত ক্ষুদে, এত মিষ্টি, যে দেখলেই তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে যায়।

হতভম্ব হয়শিরার চারদিকে ততক্ষণে উদ্যত হয়ে গিয়েছে অনেকগুলো রশ্মি বন্দুক।

চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম সামনে দাঁড়িয়ে–হয়শিরা, নাও। আবার কাঁধে তুলে নাও তোমার মজারুকে–আর ভয় নেই।

হয়শিরা তখন কথা বলবে কি, ঠক ঠক করে কাঁপছে।

হয়শিরা খাবি খেতে খেতে বললে কোন মতে–কি-কি-কি কান্ড করলে বলো তো? এযে অসম্ভব ।

অসম্ভবকে সম্ভব করাই যে আমার কাজ হয়শিরা, তাই তো আমার নাম ঘটোৎকচ। মায়াযুদ্ধ আমি জানি না–কিন্তু বুদ্ধিযুদ্ধটা ভালই জানি।

বু–বু–বুদ্ধিযুদ্ধ!

হ্যাঁ, বুদ্ধিযুদ্ধ। মনে পড়ে হলুদ গ্রহের কথা? মজারুর নিজের গ্রহের কথা? অনেক খনিজ ধাতু ছিল সে-গ্রহে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ-ছিল বইকি।

কিন্তু তখন তো কই মেলাই খনিজ, মেলাই ধাতুর একটা দানাও মুখে দেয়নি মজারু?

না তো?

কেন দেয়নি বলো তো?

আ–আ–আমি–

বুঝতে পারছো না? বুদ্ধি কম বলেই পারছো না। বুদ্ধি থাকলে এই পাগলামি করতে যেতে না–এত বড় ঝুঁকি নিতে যেতে না।

ঘ–ঘ–ঘটোৎকচ, খুলে বলো ভাই।

খুলে বলবো বলেই তো নিশ্ছিদ্র এই চেম্বারে ঢোকালাম তোমার মজারুকে– হার স্বীকারের ছলনা করে। তোমার তখনি বোঝা উচিত ছিল ঘটোৎকচ কখনো হার মানে নি, মানবে না–মানতে জানো না।

হয়শিরার মুখে আর কথা নেই!

আমি বলে গেলাম–বায়ুনিরোধক এই চেম্বারের বাতাসের উপাদান মিশ্রণ এখন কি, তা জানলেই মজারুর আচমকা ছোট হয়ে যাওয়ার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার নিরেট মগজে।

ক–কত?

হাইড্রোজেন তিন পারসেন্ট বেশী....

অ–অক্সিজেন?

চার পয়েন্ট ছ-পারসেন্ট কম।

চোয়াল ঝুলে পড়ল হয়শিরার–সেই চোয়াল–যা ঘোড়ার চোয়ালের মতোই বেধড়ক লম্বা।

নির্মম-কণ্ঠে বললাম আমি–হলুদ গ্রহে যে আবহাওয়া, এই ঘরের আবহাওয়াও এখন তাই। ঐ আবহাওয়ায় ছিল বলেই মজারু স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল–অস্বাভাবিক ক্ষমতা পায়নি–যেই বাতাসের উপাদান মিশ্রণে হেরফের ঘটল, জাগ্রত হল অবিশ্বাস্য শক্তি তার অণুপরমাণুতে। হয়শিরা, রহস্য-সন্ধানীর মতো শুধু এই সূত্রটাকেই আমি কাজে লাগিয়েছি। হলুদগ্রহের আবহাওয়া সৃষ্টি করে তার মধ্যে ওকে এনে ফেলেছি–ফলটা দেখতে পাচ্ছো চোখের সামনেই।

মাথা ঘুরে গেল হয়শিরার। জ্বর আরও বাড়ছে নিশ্চয়।

বললাম কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে–ভয় নেই মজারুকে আর ফেরৎ পাঠাবো না হলুদ গ্রহে–বড় ন্যাওটা তোমার। থাকবে এই পৃথিবীতে–এই জেলখানায় এই আবহাওয়ায়–এমনি চিড়িয়া দেখবে না পৃথিবীর মানুষ? আর তুমি কোথায় থাকবে জানো?

কো–কোথায়? জ্ঞান হারানোর আগে হয়শিরার সেই শেষ কথা।

আরেকটা জেলখানায়।

কলকাতার প্রথম ফুটবল লীগ

হান্নান আহসান

বিদেশীদের খেলা ফুটবল। কবে কোথায় এই খেলা প্রথম শুরু হয়, তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। তবে অনেকের মতে চীনদেশে ফুটবল শুরু হলেও ইংল্যান্ডে তা পরিপুষ্ট হয়েছে। আজকের ফুটবলের মত কোন বাঁধ ধরা নিয়ম ছিল না তখন। মূলত আমোদ প্রমোদের জন্য ইচ্ছে অনুযায়ী নিয়ম বেঁধে নেওয়া হত। ক্রমে ক্রমে প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজন হয়। এর কিছু পরে ফুটবল লীগ প্রথার শুরু। বিশ্বের প্রথম ফুটবল লীগ ইংল্যান্ডেই শুরু হয় ১৮৮৮ সালে। উইলিয়াম ম্যাকগ্রেগর এই প্রথার প্রবর্তক। মোট ১২ টি দল নিয়ে সূচনা হয় এই লীগের।

উমাপতি কুমার

বিজয়দাস ভাদুড়ী

ভূতি সুকুল

আমাদের দেশে উনিশ শতকের শেষের দিকে ফুটবল আরম্ভ হলেও ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাহেবদের মধ্যে কিছু কিছু খেলা লক্ষ্য করা যায়। বেনিয়া সাহেবরা ১৮৭৮ সালে ফুটবল খেলার জন্য ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম দল গঠন করে। নামকরণ হয় ট্রেডস ক্লাব। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে এ দেশীয় কোন খেলোয়াড়ের অস্তিত্ব সম্ভবপর ছিলনা। খেলা প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ওরাই অংশগ্রহণ করত। কোন বাঙালী ফুটবল খেলুক কিংবা দল তৈরী করুক–এসব ওদের সহ্য হতনা। সেজন্য এদের কাছে ফুটবল এবং সংশ্লিষ্ট সামগ্রী বিক্রি বন্ধ ছিল। কিন্তু এইভাবে কি আর প্রাণের উচ্ছাসকে দমন করা যায়! একদিকে খেলার নেশা অন্যদিকে পরাধীনতার শেকল ভাঙার একটা চাপা অথচ তকতকে উত্তেজনা নিয়ে বাঙালীরা, ভারতবাসীরা ফুটবলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজেদের শক্ত মজবুত করে তৈরী করতে লাগল।

ধীরে ধীরে তারা পোক্ত খেলোয়াড় হয়ে উঠলে তৈরী হল নতুন নতুন দল। নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার জোয়ার উপচে পড়তে লাগল। সংঘবদ্ধ হয়ে আবেদন করল–এদেশীয় শীল্ড বা লীগের খেলায় তাদের নিতে হবে। তারা জানিয়ে দিল তাদের যোগ্যতার কথা। প্রকাশ করল উন্নত ক্রীড়া শৈলী। বুট পরা এক দুর্ধর্ষ গোরা দলকে হারিয়ে দিল শোভাবাজার ক্লাব। সাহেব-দের ভিত নড়ে উঠল। বাঙালীরা সে কত ভালো এবং আকর্ষণীয় ফুটবল খেলতে পারে, তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেল। ইংরেজদের কাজে এই হার অপমানকর হলেও সেদিনের লন্ডন টাইমসের সম্পাদকীয় নিবন্ধে খেলোয়াড়দের উচ্চ প্রশংসা করা হয়। আর এই জয়ের ফলে বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীর মনোবল আরো বেড়ে ওঠে। বীর বিক্রমে খেলার মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। দাবী রাখে–তাদের নিতেই হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

ঠিক এইরকম অবস্থার মধ্যে একটি এ্যাসো-সিয়েশন গড়ার কাজে মন দিল সাহেবরা। এর আগে তারা ট্রেডস কাপের একটি টুর্ণামেন্ট পরিচালনা করেছিল। ট্রেডস কাপের প্রথম খেলা হয় ১৮৮৯ সালে। এই কাপকে তাই আরো সুসংঘবদ্ধ ভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি এ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৮৯৩ সালে সৃষ্টি হয় ইন্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন। সংক্ষেপে বলা হয় আই এফ

এ। আই এফ এ-র প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন বিচারপতি উইলিয়মস্ ম্যাকফিয়ার্সন। এ আর ব্রাউন সম্পাদকের পদ পান। ১৯৩৭ সালের আগে পর্যন্ত কোন সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিষ্ঠান ছিল না। ইন্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনই–কোলকাতায় এর সৃষ্টি হলেও–সর্বভারতীয় প্রায় সমস্ত ফুটবল খেলা পরিচালনা করত। আই এফ এ কে তাই ভারতের ফুটবলের 'জনক' বলা হয়।

১৮৯৩ সালে আই এফ এ গঠিত হওয়ার পর শীল্ডের খেলার সূচনা হলেও লীগ শুরু হয় এর আরো কয়েক বছর পরে ১৮৯৮ সালে। কিন্তু লীগ শুরু হল বটে–তবে সমস্ত ভারতীয় দল খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। ইংরেজ খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরী ৮টি দল নিয়ে আরম্ভ হল কোলকাতার মাঠে প্রথম ফুটবল লীগ। এদের মধ্যে গ্লস্টার্স ও রেঞ্জার্স ছিল শক্তিশালী দল। অপরপক্ষে ক্যালকাটা, ডালহৌসী, হাওড়া ইউনাইটেড, ওয়াই এম সি এ এবং দুই গোরা দলও নিতান্ত মন্দ ছিল না। আসলে এখনকার মত তখন লীগের কোন গুরুত্ব ছিল না। সাহেবরা নিছক শখ মেটাবার জন্য মাঠে নামতো। সর্বপ্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে গ্লস্টার্স। রানার্স-আপের সম্মান পায় রেঞ্জার্স। কিন্তু এই লীগকে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ বলা হত। পরবর্তীকালে ১৯৩৪ সালে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের অস্তিত্ব তুলে দিয়ে আই এফ এ-র অধীনে আনা হয়।

১৯১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর কোন ভারতীয় দলের লীগে অংশগ্রহণের অনুমতি মেলেনি। দলের সংখ্যা বেড়ে গেলে ১৯০৪ সালে যখন দ্বিতীয় বিভাগের প্রবর্তন হল, তখন পর্যন্তও না। এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে ১৯১১ সালের কথা। সমগ্র বাঙালী তথা ভারতবাসীর জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। অনেক আবেদন-নিবেদনের ফলে মোহনবাগানকে শীল্ডের খেলায় খেলতে দেওয়া হয় ১৯১০ সালে। প্রথম বছর খুব একটা সুবিধে করতে পারল না তারা। পরের বছর ১৯১১ সাল। একের পর এক দুর্ধর্ষ ইংরেজ দলগুলোকে পরাজিত করে মোহনবাগান প্রথম বাঙালী দল হিসেবে শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করে।

সেন্ট জেভিয়ার্সকে প্রথম খেলায় ৩–0 গোলে পরাজিত করে রেঞ্জার্সকে ২–১, রাইফেল ব্রিগেডকে ১–0 এবং মিডল সেক্সকে ৩–0 গোলে হারিয়ে মোহনবাগান সহজেই ফাইনালে পৌঁছে যায়। অপরদিকে ইস্টইয়র্কও অনায়াসেই ফাইনালে ওঠে।

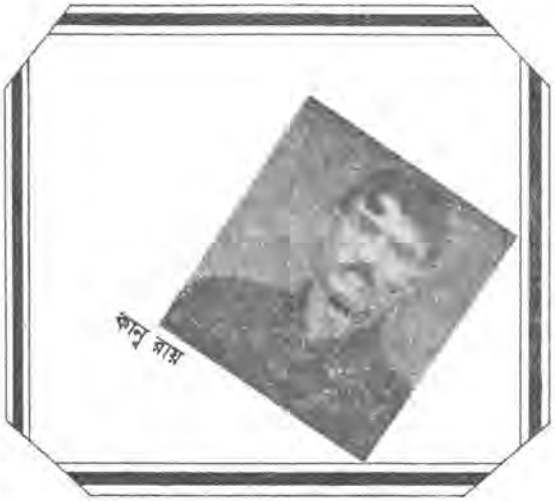

কানু রায়

শিবদাস ভাদুড়ী

হাবুল সরকার

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়েরা।

অবশেষে বহু ঐতিহ্যমন্ডিত সেই ফাইনাল খেলা। দিনটি ছিল ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই। হাজারে হাজারে মোহনবাগান সমর্থক মাঠে হাজির হল। সবার চোখে মুখে বিস্ময়–কে জিতবে! মোহনবাগান কি তাদের মুখ রাখতে পারবে?

খেলা শুরু হল। সারা মাঠ থমথমে উত্তেজনায় কাঁপছে। প্রথমার্ধের খেলায় কোন দল গোল করতে পারলো না। তাই হাফ টাইমের পর খেলা আরো জমে উঠল। খেলা শেষ হতে তখন আর ১০ মিনিট বাকি। ইস্টইয়র্ক দূরের এক ফ্রি-কিক থেকে হঠাৎ গোল করে বসে। সারা মাঠ নিথর নিঃশ্চুপ। মোহনবাগান সেন্টার করল। পুনরায় খেলা শুরু হল। দু'মিনিটের মধ্যে শিবদাস ভাদুড়ী গোল পরিশোধ করে দিলেন। মাঠে আবার উত্তেজনা ফিরে এলো। মোহনবাগান জেতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। খেলা শেষ হতে মাত্র আর তিন মিনিট বাকি। শিবদাস আবার ঝলসে উঠল। ইস্টইয়র্কের ব্যাকগুলোকে একের পর এক কাটিয়ে নিয়ে বল ফেললো অভিলাষের পায়ে। ওত পাতা অভিলাষ কাল বিলম্ব না করে বলটি জালে জড়িয়ে দেয়। ইস্টইয়র্কের দৈত্যের মত গোলরক্ষক ক্রেসী মাথায় হাত রাখলো। খেলা শেষ। সেদিনই যেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেখা দিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের দলে খেলেছিলেন হীরালাল মুখার্জি, ভূতি সুকুল, হাবুল সরকার, বিজয়দাস ভাদুড়ী, কানু রায়, সুধীর চ্যাটার্জি, মনোমোহন মুখার্জি, আর সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, অভিলাষ ঘোষ ও অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী।

এই শীল্ড জেতার পর ১৯১৪ সালে মোহনবাগান ও এরিয়ান ক্লাবের দ্বিতীয় বিভাগ লীগে খেলবার অনুমতি মেলে। এক বছরেই মোহনবাগান প্রথম বিভাগে ওঠে। এরিয়ান ওঠে পরের বছর। দ্বিতীয় বিভাগ খালি থাকার জন্য নেওয়া হয় শোভাবাজার, কুমারটুলি, টাউন ক্লাব, গ্রীয়ার ও ওরিয়েন্টালসকে। ১৯১৯ সালে জোড়াবাগান, ১৯২০ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও তাজহাট দ্বিতীয় বিভাগে খেলবার অনুমতি পায়। কিন্তু মাত্র একবছর খেলে তাজহাট লীগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলে সেই শূন্যস্থান ভরাট হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে নিয়ে। ১৯২৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে আসে ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাব। '২৪ সালে ভবানীপুরের দুটি দল খেলে। যুক্ত হয় ভবানীপুর ইম্পিরিয়াল। ১৯২৫ সালে ক্লাব দুটি মিলে গিয়ে হয় ভবানীপুর ক্লাব। ১৯১৭, '১৮ ও ১৯ সালে কুমারটুলি তিন-তিনবার প্রথম বিভাগে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেও খেলবার অনুমতি পায়নি। কেননা প্রথম বিভাগে তখন মোহনবাগান ও এরিয়ান খেলছিল। তৃতীয় কোন ভারতীয় দলকে তাই নেওয়ার নিয়ম ছিল না। ১৯১৯ সালে কুমারটুলি এককভাবে লীগে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। প্রথম বাঙালী লীগ চ্যাম্পিয়ন দল বলতে কুমারটুলিই।

২২ টি খেলায় ৩৫ পয়েন্ট পেয়ে মোহনবাগান সর্বপ্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৩৯ সালে। এর আগে

১৯৩০ সালে মোহনবাগান দলের প্রখ্যাত খেলোয়াড়গণ।

১৯৩৬ সালে মহামেডান প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে লীগ জয় করে।

ইস্টবেংগল ১৯২১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে খেলবার সুযোগে ২৪ টি খেলায় ৩২ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করে। চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট কেন্টস 'বি' দল। প্রথমার্ধের লীগে ইস্টবেংগলের কাছে কেন্টস পরাজিত হয়েছিল ১–0 গোলের ব্যবধানে। তিনবছর খেলার পর ১৯২৪ সালে ক্যামেরনস 'বি' দলের সংগে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়নশীপের মর্যাদা লাভ করে দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম ডিভিসনে ওঠে ইস্টবেংগল।

প্রথম ডিভিসনে উঠেই ভালোয় ভালোয় খেলা শুরু করে। লীগে মোহনবাগানের সংগে তাদের প্রথম সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল এই বছরেই। তারিখ ছিল ১৯২৫ সালের ২৮ মে, বৃহস্পতিবার। সদ্যোন্নীত ইস্টবেংগল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে খেলে মোহনবাগানকে পরিষ্কার ১–0 গোলে পরাজিত করে। ১৬টি খেলায় সর্বসাকুল্যে ১৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তারা লীগ টেবিলে তৃতীয় স্থানটি দখলে নেয়।

১৯২৬ এবং '২৭ দু'টি বছর কোন রকমে কাটাবার পর '২৮ সালে ইস্টবেংগলের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্ভাগ্যের করাল ছায়া। অধিকাংশ খেলোয়াড়ের অক্ষমতার জন্য তার ১৮টি খেলায় মাত্র ৯টি পয়েন্ট সংগ্রহ করে সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী হওয়ায় দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যায়।

দু'বছরে যেতে না যেতেই ১৯৩১ সালে ইস্টবেংগল আবার প্রথম বিভাগে চলে আসে এবং দৃঢ় মনোবল ফিরে পায়। কয়েক বছরের মধ্যে নিজেদের সামলে নিয়ে ১৯৪২ সালে মহামেডানকে ৩ পয়েন্ট পিছনে ফেলে তারা প্রথমবার লীগ জয়ের সম্মান অর্জন করে।

সে বছর প্রথম ডিভিসনে ২৪টি দল ছিল। দল বদলের শুরুতেই ইস্টবেংগল বর্মার পাগসলীকে পেয়ে যায়। সেন্টার ফরোয়ার্ডের এই খেলোয়াড়টির তখন সারা দেশে নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দম শক্তি আর স্কিলের সমন্বয়ে এক দুর্দান্ত খেলোয়াড়। পাগসলীকে দলে এনে তাই ইস্টবেংগল বাড়তি মনোবল পেয়ে যায় এবং বীর বিক্রমে লীগ শুরু করে। প্রথম খেলায় তারা পুলিশকে ২–0 গোলে পরাজিত করে একে একে ৩–0 গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে, রেঞ্জার্সকে ২–১ এ, ৪–0 গোলে ডালহৌসী এবং পঞ্চম খেলায় ক্যালকাটাকে ৫–0 গোলে হারিয়ে সকলকে অবাক করে দেয়। গত বছরের লীগ জয়ী মহামেডান স্পোর্টিং-এর সংগে তারা ষষ্ঠ খেলায় মিলিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১–২

১৯১১ সালে সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ভারতীয় দল–মোহনবাগান।

এর তফাতে হার স্বীকার করতে হল। কাস্টমস, এরিয়ান এবং ভবানীপুরকে যথাক্রমে ৩–১, ৩–০ ও ১–০ গোলে পরাজিত করে একাদশতম খেলায় তারা প্রথম আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের সম্মুখীন হয়। এই খেলায় মোহনবাগান ১–২ গোলে পরাজয় বরণ করে। ইস্টবেংগলের পক্ষে গোল করেন সুনীল ঘোষ ও সোমানা। নিমু বসু মোহনবাগানের পক্ষে একটি গোল পরিশোধ করেন।

রিটার্ন লীগের ব্যবস্থা ছিল তখন। তাই ফিরতি লীগে তারা ক্যালকাটাকে ৬–0 গোল দিয়ে শুরু করল। এরপর ডালহৌসী ও রেঞ্জার্সকে ৫–0-র ব্যবধানে ধরাশায়ী করে। বি, এন্ড, এ, রেল ও মহামেডানের সংগে খেলা অমীমাংসিত থাকে। ১–0 গোলে ভবানীপুরকে, স্পোর্টিং ইউনিয়ন কে ২–0, কাস্টমসকে ৫–0 ও এরিয়ানকে ৪–0 গোলে হারিয়ে দেয়। মোহনবাগান আবার পরাজিত হয়। এবারে ব্যবধান ১–0 থাকে। গোলটি করেন সোমানা। এই খেলাটি ছিল তাদের শেষ পর্যায়ের। সুতরাং মোহনবাগানকে হারানোর সংগে সংগে তারা ১৯৪২ সালের লীগ চ্যাম্পিয়নের অনন্য গৌরবের অধিকারী হয়। ২৬টি গোলের সুবাদে সোমানা সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানে ভূষিত হন।

ইস্টবেংগল ২৪টি খেলায় ৪৩ পয়েন্ট অর্জন করে। মহামেডান ৪০ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং ৩৬ পয়েন্ট লাভ করে মোহনবাগানের স্থান হয় তিন নম্বরে।

প্রথম লীগ জয়ী ইস্টবেংগল দলের অধিনায়ক ছিলেন এ.সি. সোমানা। সোমানা ছাড়া দলে ছিলেন অমিতাভ মুখার্জি, নীহার মিত্র, রাখাল মজুমদার, পরিতোষ চক্রবর্তী, অনিল নাগ, শিশির ঘোষ, মহম্মদ আমিন, নগেন রায়, সুনীল ঘোষ, পাগসলী, রবি দে, টবি বসু, ফটিক সিংহ, গিয়াসুদ্দিন, প্রশান্ত দাশ, আপ্পা রাও, কৃষ্ণ রাও, সুশীল চ্যাটার্জী, নজর মহম্মদ. অসীম চ্যাটার্জী ও সুহাস চ্যাটার্জি।

দুঃখ সুখের ক্রিকেট

জয়ন্ত দত্ত

আলেক আর এরিক দুই ভাই। দেখতে একই রকম। আর এই একই রকম দেখতে বলে, ওদের দুজনকে নিয়ে প্রায়ই গোলমাল করে ফেলে সকলে।

তোমরা যারা ক্রিকেট খেলা নিয়ে আলোচনা কর, তারা নিশ্চয়ই এই দুই ভায়ের নাম শুনেছ। আলেক বেডসার বিশ্বের একজন নামী বোলার। বহু ঐতিহাসিক ম্যাচের তিনি হলেন অংশীদার। তাঁর মতো বোলার বিশ্ব ক্রিকেটে আজও বিরল বলা যায়। আর এরিক–টেস্ট ক্রিকেটে এরিক বেডসার স্থান না পেলেও, কাউন্টি ক্রিকেটে তাঁর মতো ওস্তাদ ব্যাটসম্যান খুব কমই ছিল। দুই ভাই-ই খেলতেন সারে দলে।

একই দলে দুই ভাই খেলার জন্য প্রায়ই সবাই ওঁদের চিনতে গণ্ডগোল করে ফেলতেন। কাউন্টি ক্রিকেটে এই দুই ভাইকে নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মজার মজার গল্প।

যেমন ধর–সারে দল ফিল্ডিং করছে। ক্যাপটেন ফিল্ডিং সাজিয়ে আক্রমণের জন্য নতুন বল তুলে দিলেন বোলার আলেক বেডসারকে। অথচ দেখা গেল ক্যাপটেন যাঁকে আলেক বলে বল হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই তিনি আবার তাঁর ভাইকে ডেকে বল হাতে তুলে দিচ্ছেন। ব্যাপার কি?

ক্যাপটেন সাহেব জবাব দিলেন ক্যাপটেনের মনে হওয়া আলেক বেডসার–আমি আলেক নই। তারপর একটু থেকে ক্যাপটেনের ভুল ধরিয়ে বললেন, ভুলটা তোমার হয়েছিল স্কিপার, তাই সংশোধন করে দিলাম।

এমন ঘটনা একবার নয় বহু বার হয়েছে। যেমন ধর, একটা ম্যাচে অলেক সাত/আটটা উইকেট পেয়েছেন–অতএব কাগজের সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানেরা ছুটলেন আলেকের ছবি তোলার জন্য।

ড্রেসিং রুমে ঢুকেই তাঁরা দেখতে পেলেন এরিককে। তাঁকে দেখামাত্র সবাই তাঁর দিকে ছুটে এলেন আলেক মনে করে। ছবি উঠলো। এরিক কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেও মুখ খুললেন না। তিনি চুপচাপ ওঁদের কথার উত্তর দিতে লাগলেন।

এরপর প্রশ্নোত্তর ও ছবি তোলার পালা শেষ হলে এরিক ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের ক্যামেরায় আরও ফিল্ম আছে তো?

কেন স্যার?

বারে আপনারা আলেকের ছবি তুলবেন না? তাঁর ছবি তুলতেই তো এসেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাহলে আপনি?

এবার হো হো করে হেসে এরিক বললেন, আমি এরিক বেডসার। আলেক ভিতরে আছে, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এরিকের কথা শুনে সবাই তো থ!

আর একবার কাউন্টি ক্রিকেটের খেলার মজার এক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক।

ক্লাব লীগের এক খেলায় দলের তখন কাহিল অবস্থা। দলের নামী ব্যাটসম্যানেরা সবাই আউট। একমাত্র মাঠে নামতে বাকি শেষ ব্যাটসম্যান আলেক। কিন্তু আলেকের পক্ষে প্রয়োজনীয় তিরিশ রাণ করা সম্ভব নয়। তাহলে উপায়!

কোন চিন্তা নেই, ক্যাপটেনকে অভয় দিয়ে আলেক মাঠে নামলেন। ব্যাটিং করলেন চমৎকার, দেখে মনে হলো পাকা একজন ব্যাটসম্যান। রাণ উঠে এলো তরতর করে–ম্যাচ জিতে গেল সারে। সবাই প্রশংসা করলো আলেকের।

বাড়ি ফিরে দুই ভাইয়ের সে কি হাসি–আজ তারা কেমন ঠকিয়েছেন মাঠসুদ্ধু মানুষকে। কেউ চিনতে পারেন নি আলেক বেডসারের বদলে ব্যাটধারী এরিক বেডসারকে।

যে ক্রিকেট এমন মজার, সেই ক্রিকেটেই আবার আছে চরম দুঃখ। আলেক বেডসার নামটির সঙ্গে ক্রিকেটের সুখ-দুঃখ গভীরভাবে জড়ানো। তোমরা হয়ত শুনলে অবাক হবে এতবড় যে বোলার আলেক বেডসার, যাঁকে সারা দুনিয়ার ক্রিকেটারেরা একসময় ভয় করতেন, সেই তাঁকে দুঃখজনক এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে যেতে হয়।

সেটা ছিল ১৯৫৩ সালের ক্রিকেট মরশুম। লেন হাটনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। হাটন সাহেবের খুব ইচ্ছে এই সফরে অস্ট্রেলিয়াকে জব্দ করতে ট্রুম্যানের পাশে টাইসনকে খেলানোর। কিন্তু দল থেকে বসানো হবে কাকে? হাটন মনে মনে চান বেডসারকে বসিয়ে দিতে। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করবেন কি করে? আলেক বেডসার তখন সবার চোখের মণি। তবু উপায় একটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেন। দলের সহ অধিনায়ক ডেনিস কমটনকে ডেকে খুব গোপনে কথাটা বললেন। কমটন বললেন, সর্বনাশ! বেডসারকে বসানোর সাহস কার আছে?

লেন তবু কমটনকে বোঝাতে লাগলেন। বেচারা কমটন আর কি করেন, বললেন, ঠিক আছে দেখছি কি করা যায়।

মাঠে পৌঁছে কমটন বেডসারকে নিয়ে মাঠ পরীক্ষা করতে গেলেন। মাঠ দেখার পর কমটন বললেন, কি রকম বুঝলেন আলেক।

–চমৎকার পিচ, আমার বোলিংয়ের পক্ষে উপযুক্ত।

কমটন কথা বাড়ালেন না। ফিরে এসে হাটনকে বললেন বেডসারের মন্তব্য। হাটনের চিন্তা আরও বেড়ে গেল। তাহলে কি টাইসনকে খেলানো যাবে না! এদিকে টস হয়ে গেল। ইংল্যান্ড খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করলো না। সবাই উৎকণ্ঠিত কে কে খেলছেন?

মাঠে আম্পায়ার নামছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বেডসার ঢুকলেন টয়লেট রুমে। তিনি মাঠে নামছেন। তাঁকে বসায় কে?

বেডসারকে টয়লেট রুমে ঢুকতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাটন তাঁর প্লেয়ার লিস্ট দ্রুত হাতে লিখে ডেসিংরুমের দরজায় চুয়িং গাম দিয়ে সেঁটে টাইসনকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন।

বেডসার ফিরলেন। ডেসিংরুমের কাছে পৌঁছে তিনি অবাক। এ কি! তাঁকে ছাড়াই দল নিয়ে হাটন মাঠে নেমে পড়েছে। ধীর পায়ে এসে বেডসার দাঁড়ালেন ড্রেসিংরুমের জানলার সামনে। দেখতে পেলেন হাটন বল তুলে দিচ্ছেন নবাগত টাইসনের হাতে।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল। মনে মনে বুঝেছিলেন তাঁর সময় শেষ হয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে–এবার তাঁকে বিদায় নিতে হবে।

এতবড় অপমান সত্ত্বেও বেডসার কিন্তু গোটা মরশুমে একদম মুখ খুললেন না। হাটন সাহেবের কপাল জোর–এই ম্যাচে টাইসন দুরন্ত বোলিং করেছিলেন। যদি টাইসন সফল না হতেন, তাহলে সেই মরশুমে হাটনের ভাগ্যে যে কি ঘটতো বলা শক্ত।

কল্পনা, অনুকরণ ও অভ্যাসজনিত রোগ

ভুবনমোহন মিত্র

পুরোনোদিনের পাতা

বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগে যে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির 'বালক' তার একটি। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে। যার ১ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র, ১২৯২ সাল) থেকে ভুবনমোহন মিত্র'র' কল্পনা, অনুকরণ ও অভ্যাসজনিত রোগ' রচনাটি তোমাদের জন্য এবার পুরনো দিনের পাতায় তুলে দেওয়া হলো। রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে।

কতকগুলি রোগ ছোঁয়াচে অর্থাৎ স্পর্শজন্য একথা সকলেই অবগত আছেন। অনেকে বসন্তের রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। ভৌতিক সংযোগে দেহ হইতে দেহান্তরে রোগের বীজ পরিচালিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু রোগের বিষয় দূর হইতে চিন্তা করিয়া বা রোগীর অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করিতে গিয়া তৎরোগাক্রান্ত হওয়া বিস্ময়জনক কথা সন্দেহ নাই।

মহামারীর সময়ে চিকিৎসকেরা যতদূর সম্ভব প্রসন্ন মনে থাকিতে পরামর্শ দেন। যিনি যত অধিক ভীত হন তাঁহার বিপদের আশঙ্কা তত অধিক। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে। রোগের ছবিটি সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া না রাখিয়া মনকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করিলে এই চিন্তাজনিত পীড়ার আশঙ্কা থাকে না। যথার্থ পীড়া এবং এইরূপ পীড়ার মধ্যে সম্বন্ধ নিকট, তাহা আমরা ক্রমশঃ বিবৃত করিব।

একটি তিন বৎসরের বালিকা প্রত্যহ ভৃত্যের কোলে উঠিয়া বেড়াইতে যাইত, ভৃত্যের এক চক্ষু টেরা ছিল, কিছু দিন পরে দেখা গেল বালিকা ভৃত্যের বক্রদৃষ্টির অনুরকণ করিতে শিখিয়াছে, আমোদ দেখিবার জন্য কেহ অনুরোধ করিলেই বালিকা বক্র দৃষ্টি করিয়া দেখাইত। ক্রমে কেহ দেখিত না চাহিলেও বালিকার অক্ষিগোলক অনেক সময়ে স্থানভ্রষ্ট হইতে দেখা যাইত। ক্রমে এই রোগ বদ্ধমূল হইল।

আর একটি বালিকা কম্পবায়ু রোগগ্রস্ত কোন আত্মীয়াকে দেখিতে গিয়াছিল। রোগীকে নানা রূপ হস্ত সঞ্চালন এবং মুখভঙ্গী করিতে দেখিয়া বালিকা তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। বালিকা সর্ব্বদাই রোগীর কাছে বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। বাড়ী ফিরিয়া যাইয়াও কয়েক দিন যাবৎ রোগীর অঙ্গভঙ্গী অভিনয় করিল। মধ্যে মধ্যে বালিকা রোগীকে দেখিতে আসিত এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিন কয়েক হাত পা ছুড়িত। কিছু দিন পরে এই আত্মীয়ার মৃত্যু হওয়াতে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইল, কিন্তু বালিকার রোগ পাকা হইয়া দাঁড়াইল। অতিপরিশ্রম বা অন্য কোন কারণে মানসিক অবসাদ জন্মিলেই রোগের সমুদয় লক্ষণ স্ফুট হইত, সামান্য সূত্র ধরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ ক্রমে এত শক্ত হইয়া দাঁড়াইল যে সকল চিকিৎসা নিস্ফল হইল।

যথার্থ পীড়ার ন্যায় অনুচিকীর্ষাজনিত পীড়াও অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষে অবরুদ্ধ না থাকিয়া বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গল্প করিয়াছেন একদা একজন স্ত্রীলোক তাঁহার বাড়িতে বেড়াইতে আসে–তাহার কম্প রোগ ছিল। একটী বালক দেখিয়াই তাহার অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিল। এই বালককে দেখিয়া আর এক জনেরও রোগের

লক্ষণ প্রকাশ হইল। রোগ ক্রমে সমুদয় পরিবারে ছড়াইয়া পড়িত সন্দেহ নাই, কিন্তু রোগীদিগকে পৃথক ঘরে আটকাইয়া রাখা হইল বলিয়া ততদূর হইতে পারিল না। রোগীদ্বয় কয়েক সপ্তাহ কয়েদ থাকিয়া প্রতীকার লাভ করিল।

সকলেই যে সাধ করিয়া অনুকরণ করিতে যান তাহা নহে, অনেক সময়ে কি যে এক দুর্দ্দাম শক্তির বলে স্বতঃই অনুকরণের কার্য্য হইতে থাকে।

স্ত্রীলোক কোন ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন, সর্ব্বদাই কাছে থাকিতে হইত। কিছু দিন পরেই তিনি রোগীর মত শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে এবং কাসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রোগের অপর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর ঠিক কাসের রোগীর ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল, কালক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং এই কৃত্রিম রোগ অচিরাৎ এরূপ আকার ধারণ করিল যে বন্ধুবর্গ যুবতীর জীবিতাশা একরূপ *বিসর্জ্জন দিলেন।* যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কিন্তু ফুসফুসে রোগের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। বহু চিকিৎসায়ও কোন ফল দর্শিল না অবশেষে দুই বৎসর পরে রোগ আপনাআপনি ভাল হইয়া গেল।

প্রত্যক্ষ না করিয়া অন্যের মুখে বর্ণনা মাত্র শুনিয়াও অনেক সময়ে এই শ্রেণীর রোগ জন্মিতে দেখা যায়। কোন যুবতীর এক বন্ধুর পক্ষাঘাত রোগ হয়, যুবতী রোগীকে দেখিতে যান নাই। কিন্তু কাহারও মুখে সবিস্তার বর্ণনা শুনিয়া নিজের শরীরে রোগের অনুপ্রবেশ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে তাঁহার পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে মাজা পর্য্যন্ত পড়িয়া গেল, উঠিয়া বেড়ান দূরে থাক, ক্রমে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনও অসাধ্য হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিলেন, কেহই কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে একদিন পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে আর্ত্তনাদ শুনিয়া রোগী নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া শশব্যস্তে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ঐ ঘরে একজন আত্মীয় মুমূর্ষু অবস্থায় শায়িত ছিলেন। মনের আবেগে শারীরিক স্বাস্থ্য যেন কোথায় চলিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে রোগী আরোগ্য লাভ করিলেন।

এদেশী কোন পর্ব্বোপলক্ষে বাজী হইতেছিল, একজন বাজীকর পা টানিয়া আনিয়া বক্ষোলগ্ন করিয়া দেখাইল। একটী ইংরেজি বালিকা বাজী দেখিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিল। পরদিন প্রাতে আর শয্যা ত্যাগ করিতে পারে না। দেখা গেল তাহার এক পা বাঁকিয়া আসিয়া শরীরে দৃঢ়লগ্ন হইয়া *রহিয়াছে। মিনতি, বলপ্রয়োগ* সমুদয় ব্যর্থ হইল। আরক শোঁখাইয়া অচেতন করিলে পা সহজেই টানিয়া সোজা করা যাইত, কিন্তু সংজ্ঞা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পা আবার বাঁকিয়া দাঁড়াইত, অনেক দিন এই অবস্থায় গেল। অবশেষে এই মহিলা ইংলণ্ডে নীত হইলেন। একদিন একাগ্রচিত্তে সতরঞ্চ খেলা দেখিতেছিলেন। সতরঞ্চ খেলায় মনের কত ঐকান্তিকতা জন্মে তাহা কাহারও অবদিত নাই। অজ্ঞাতসারে একজন বন্ধু আস্তে আস্তে পা টানিয়া সোজা করিয়া দিলেন। জানিতে পারিয়াই মহিলা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বেশ সহজ মানুষের মত হাঁটিয়া গেলেন একটু কষ্ট পাইলেন না।

অভ্যাস যখন এমন গুরুতর হইয়া উঠে যে ইচ্ছা করিয়াও তাহাকে অতিক্রম করা যায় না, তখন তাহাকে রোগ বলা যাইতে পারে। আদৌ ইচ্ছা হইতে প্রসূত হইয়া ক্রমে তাহা আমাদের ইচ্ছা-শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই রোগের প্রভাবে আমরা স্বেচ্ছাধীন মানব হইয়াও জড় যন্ত্রের ন্যায় হইয়া উঠি। সামান্য সামান্য বিষয়ে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ একটা শব্দ বিশেষের এত ভক্ত হইয়া পড়েন যে তাঁহারা যত কিছু লেখেন তাহার কোন না কোন স্থানে প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক এই শব্দটী না বসাইয়া থাকিতে পারেন না, চিঠির মধ্যে লিখিতে বিস্মৃত হইলে পুনশ্চসাৎ করেন, কিন্তু না লিখিয়া স্বস্তি নাই। আমার একজন আত্মীয় চিঠি লিখিয়া চারি কোণ কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিতেন। অতি সামান্য কাগজেই প্রায় চিঠি লিখিতেন, *দেখিয়া* মনে করিলাম কাগজের পার্শ্বের বন্ধুরতা দূর করাই বুঝি ছাঁটার উদ্দেশ্য। বোধহয় প্রথমে এই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু শেষে অতি মসৃণ বিলাতী চিঠির কাগজ দিয়া দেখিয়াছি লেখা সারা হইলেই কাঁচি তলব করিয়াছেন।

বিখ্যাত কোষকার জন্‌সন্ সাহেব রাস্তার পার্শ্বস্থ প্রত্যেক আলোক স্তম্ভ স্পর্শ না করিয়া অগ্রসর হইতেন না। টামস্ উইলিয়াম একটা সুন্দর গল্প করিয়াছেন, তাঁহার এক প্রতিবেশী ঘড়ি বাজিলেই প্রতিবার সঙ্গে সঙ্গে এক দুই তিন করিয়া গণিত। ক্রমে শব্দ না শুনিয়াও সে ঠিক বাজার সময়ে মুখে ঘড়ির অনুকরণ করিত। এক মিনিট এ দিক ওদিক হইত না।

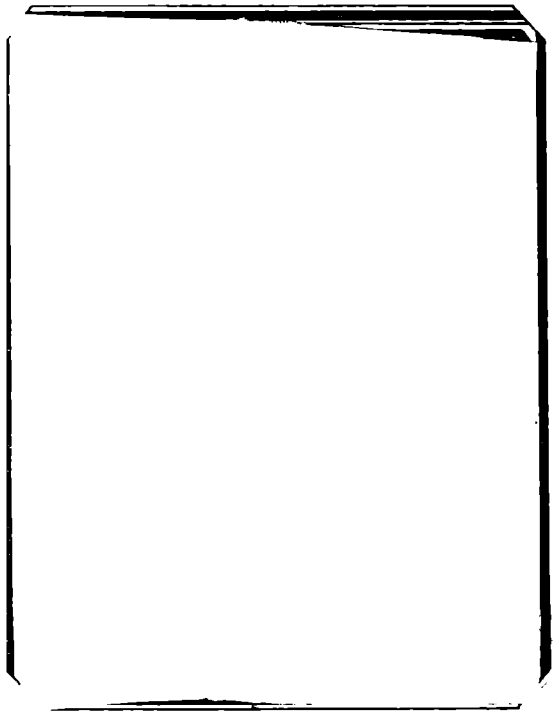

হারানো দিনের কথা

স্কুলের প্রথম দিন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এমন সব লেখা লিখে গেছেন, যা তরুণ ও বয়স্ক–দু ধরনের সাহিত্যসেবীদেরই ভাবিয়ে তুলছে। তাঁর অজস্র লেখা এখনও সাহিত্যের দিক চিহ্ন হয়ে আছে। হারানো দিনের কথা পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই লেখাটি কিন্নর রায়ের সৌজন্যে পাওয়া গেছে। এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে সেই মহৎ লেখকের একটুকরো ছেলেবেলা।

স্কুলে ভর্তি হবার দিনটি মনে পড়ে। অবশ্য তার আগেই বাড়িতে ক'দিন ধরে বাবা কাকা পিসিরা বলাবলি করছিলেন, ধনুকে এবার স্কুল দাও–স্কুলে ভর্তি হবার বয়স হয়েছে। কেবল কি বয়সের দিকে নজর ছিল সেদিন। তার আগে ছেলেটি বা মেয়েটি বাংলা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের সব কটা বানান মুখে বলতে ও লিখতে শিখেছে কিনা, তার দিকে বাড়ির লোকের সজাগ দৃষ্টি থাকত। বাংলা বানান ও সেই সঙ্গে 'হাতি', 'বাঘ' 'পাখি', 'মাছ', 'জল' ইত্যাদি হরেক শব্দের ইংরেজি শিখল কিনা, সেদিকেও সকলের কড়া নজর ছিল। না, সাড়ে তিন বা চার বছর বয়সে বাচ্চাদের ইস্কুলে দেবার রেওয়াজ সে যুগে ছিল না। আমি যখন স্কুলে ভর্তি হই, তখন আমার বয়স ঠিক আট। আমার ছোটকাকার বয়স ছিল সাত। ঠাকুর্দার হাত ধরে সেদিন আমরা দুজন স্কুলে গিয়েছিলাম। ঠাকুর্দা–আমার পিতামহ মানুষটা বড্ড সরল প্রকৃতির ছিলেন। ভিতরে প্যাঁচ বলতে কিছু ছিল না। এই জন্য পরে বাড়িতে তাঁকে কথা শুনতে হয়েছিল। বাড়ির সবাই আশা করেছিলেন আমার ও ছোটকাকুর স্কুলের বয়স কমিয়ে দিয়ে যথাক্রমে ছয় ও পাঁচ লিখিয়ে আসবেন। ঠাকুর্দা তা করেন নি। আমাদের সঠিক বয়সটাই স্কুলের খাতায় লিখিয়ে এসেছিলেন। হ্যাঁ, মনে আছে বেলা দশটা বাজতে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মাছের ঝোল ও গরম ভাত খেয়ে ধোয়া একখানা সার্ট গায়ে হাফ প্যান্ট পরে প্রথম দিন স্কুলে গিয়েছিলাম। ছোট্ট মহকুমা শহরের লাল সুরকি ঢালা সড়ক। জানুয়ারীর ফুটফুটে রোদে রাঙা দিন। ঠাকুর্দার হাত ধরে পিল পিল করে হেঁটে সেই লম্বা টিনের ঘরে, দরমার বেড়া ঘেরা সুন্দর সারি সারি দরজা-জানালা বসান ঘরটা ছিল আমাদের স্কুল। মাইনর স্কুল। ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ঐ স্কুলের পাঠ ছিল। মাইনর স্কুলের বেড়া ডিঙোলে পরে হাই স্কুলে পড়তে যেতে হত। অন্নদা হাই ইংলিশ স্কুল আর অন্নদা মাইনর স্কুল–দুটো বিদ্যালয়ই পাশাপাশি ছিল। বিদ্যাভবন দুটোর চারদিকে সবুজ মাঠ। দু'দিকে দুটো প্রকান্ড দীঘি। দীঘির পারে ঝাউ ও বট গাছ। অদূরেই কালীবাড়ি। টগর, কাঞ্চন, স্থলপদ্ম, রক্তজবার বাগান দিয়ে সেই ছোট্ট অন্ধকার মতন ঠান্ডা কালীমন্দিরের স্মৃতি আমাদের স্কুলের পড়ুয়াদের রক্তের মধ্যে যেন মিশে আছে। সেই মন্দিরের ছবি ভোলা যায় না।

যাক, হাফপ্যান্ট পরে সার্ট গায়ে ধনু ও তার ছোটকাকু বিভু চলেছে বুড়ো প্রকাশ নন্দীর হাত ধরে স্কুল ভর্তি হতে। না, জুতো মোজা ছিল না আমাদের পায়ে। উনিশ শ বিশ সালে ছোট্ট মফঃস্বল শহরের

ছেলেমেয়েরা জুতো মোজা পরে স্কুলে যেত না। সেই রেওয়াজ ছিল না। তবে স্কুল ইন্‌সপেকটার বা বড় সরকারী কোনো কর্মচারী স্কুল পরিদর্শনে আসবেন বা স্কুলের প্রাইজের দিন আমরা অনেকেই জুতো মোজা পরে ও ধোপদুরস্ত পোশাক-আসাক গায়ে স্কুলে গেছি। এ ছাড়া সাধারণ দিনে আমাদের অত্যন্ত সাদাসিদে পোশাকই গায়ে থাকত। তা বলে ময়লা নোংরা জামাকাপড় একটি ছেলের গায়েও থাকত না। মা মাসীরা বাড়িতে সোডার জলে সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে এবং ঘরেই নিজেদের হাতে ইস্ত্রি টেনে আমাদের স্কুলের পোশাকটি সর্বদা তৈরি করে রাখতেন। সিল্ক সার্টিন টেরিলিন টেরিকট আমরা স্কুল ছাত্ররা চোখেও দেখিনি। বিলাসিতা জিনিসটাই মানুষের অজানা ছিল। সে সব রাজা জমিদারদের জন্য–সবাই জানতাম। ঠান্ডা পড়লে দু খানা সূতীর জামা গায়ে উঠত। গ্রীষ্মে একখানা। আর শীতকালে একখানা সূতীর চাদর। সেদিন যদিও খদ্দর বস্ত্রটার আবির্ভাব ঘটেনি। পরে অবশ্য একটু বড় হয়ে আমরা ঠান্ডার সময় মোটা খদ্দরই প্রচুর ব্যবহার করতাম। মধ্যবিত্ত পরিবার আজকের দিনের মত কথায় কথায় উল, পশমী জিনিসের ব্যবহারের চল সেদিন ছিল না।

ঠাকুর্দার হাত ধরে স্কুল-ভবনের কাছে পৌঁছে গেলাম। তখনও স্কুলের ঘন্টা পড়েনি। দেখলাম বড় ও ছোট কত স্কুল পড়ুয়া ছেলে আমাদের অনেক আগেই স্কুলে পৌঁছে গেছে।উঁহু, ক্লাসঘরে যেন কেউ বসে নেই। স্লেট খাতা ও বইপত্র ক্লাসের বেঞ্চির ওপর রেখে যে যার মত রাস্তায় মাঠে বেরিয়ে এসে খেলাধুলোয় মেতে উঠেছে। সে এক দৃশ্য। রাস্তার ধারের বট ও আম গাছের ছায়ায় তখনই সারি সারি ফেরিওয়ালা বাদাম চানাচুরের ডালা সাজিয়ে অনবরত হাঁকছে। কোথাও ছেলের দল গুলি খেলছে। কোথাও কচি বাতাবি নেবু সদ্য গাছ থেকে পেড়ে এনে বল খেলছে। রবারের বল চামড়ার বলও চোখে পড়ল। এখনকার মত ক্রিকেটের বল সেই আমলে মোটেই ছিলনা। ডাংগুলিও খেলছিল কিছু ছেলে। ক'জন যেন হা-ডু-ডু খেলছিল। আমার ও ছোটকাকুর ইচ্ছে করছিল তখনই ওদের সংগে ভিড়ে খেলায় মেতে যাই। আবার ওদিকে খুব ভয়ও করছিল। সবে স্কুলে প্রথমদিন ভর্তি হতে এসেছি–বুকের ভিতর কিরকম যেন দুর দুর করছিল। আমরা স্কুল ভবনের কাছে পৌছে যাবার সংগে সংগে ঢং ঢং করে স্কুলের ঘন্টা পড়ে গেল। দেখলাম হাঁটুর কাছে কাপড় পরা গেঞ্জি গায়ে বেঁটে খাটো খোঁচা খোঁচা কাঁচা দাড়ি মুখে একটি মানুষ স্কুলের একদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দড়ি বাঁধা একটা পেতলের ঘন্টিতে একটা লোহার হাতুড়ি দিয়ে জোরে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম এই মানুষটির নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর দাস। স্কুলের দপ্তরী। আর অনেক পরে এই ঈশ্বরের নাম শুনেছি ঘন্টার কাছে কাছে ক্লাস থেকে বেরিয়ে [illegible] না করেছি।

ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠতেই ছেলের দল খেলাধুলো ছেড়ে হুড়মুড় করে যে যার ক্লাসে ঢুকে পড়ল। আমরা কিন্তু কোনো ক্লাসে ঢুকলাম না। ঠাকুর্দার হাত ধরে প্রকাশবাবু প্রথম সারির প্রথম ঘরটিতে ঢুকলেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে ঘরের ভিতর পা দেবার সময় চৌকাঠে পা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ঠাকুর্দা দুঃখ ও বিরক্তি সূচক একটা শব্দ করলেন ও আমার হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বোধ মনে মনে বললেন, প্রথম দিন স্কুলে ঢোকার মুখেই আছাড় খেল আমার নাতি–বেচারার পরবর্তী স্কুল জীবন কি শুভ হবে! শুভ হয়েছিল কিনা জানি না–তবে ফি বছর অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অন্তত প্রথম তিনজনের মধ্যে নম্বর পেয়ে টপাটপ উঁচু ক্লাস গুলিতে উঠে গিয়েছিলাম ও নির্বিঘ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পরীক্ষাটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়েছিলাম। শিশু দুটির হাত ধরে প্রকাশবাবু স্কুলের অফিস ঘর অর্থাৎ খোদ হেডমাস্টারের কামরায় ঢুকলেন। শশীবাবু হেডমাস্টারের নাম–ঠাকুর্দাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে প্রকাশবাবু যে, আসুন আসুন। বসুন। ঠাকুর্দা একটা চেয়ারে বসল। একটা বড়সড় টেবিলের ওধারে হেডমাস্টার-মশাই। এদিক ওদিক কয়েকটা চেয়ারে বুড়ো বুড়ো কয়েকজন শিক্ষক। একটু দূরে একটা পিঠতোলা লম্বা বেঞ্চের ওপর যুবক ও প্রৌঢ় চেহারার আরও কয়েকজন বসে আছেন দেখলাম। পরে বুঝেছিলাম তাঁরা সকলেই শিক্ষক। আমি ও কাকু ঠাকুর্দার চেয়ারের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে ফরসা গোলগাল চেহারার চশমা চোখে হেডমাস্টারমশাই শশী চক্রবর্তী ও তাঁর পিছনে দেওয়ালে ঝুলান ভারতবর্ষের মানচিত্রটি দেখছিলাম। এতবড় ভারতবর্ষ এর আগে আমরা কোনদিন দেখিনি। বাড়িতে বড় কাকুর ছোট ছোট মানচিত্র আঁকা অ্যাটলাস খানা দেখার অভিজ্ঞতাই শুধু হয়েছিল।

ফটো □ কল্যাণ চক্রবর্তী

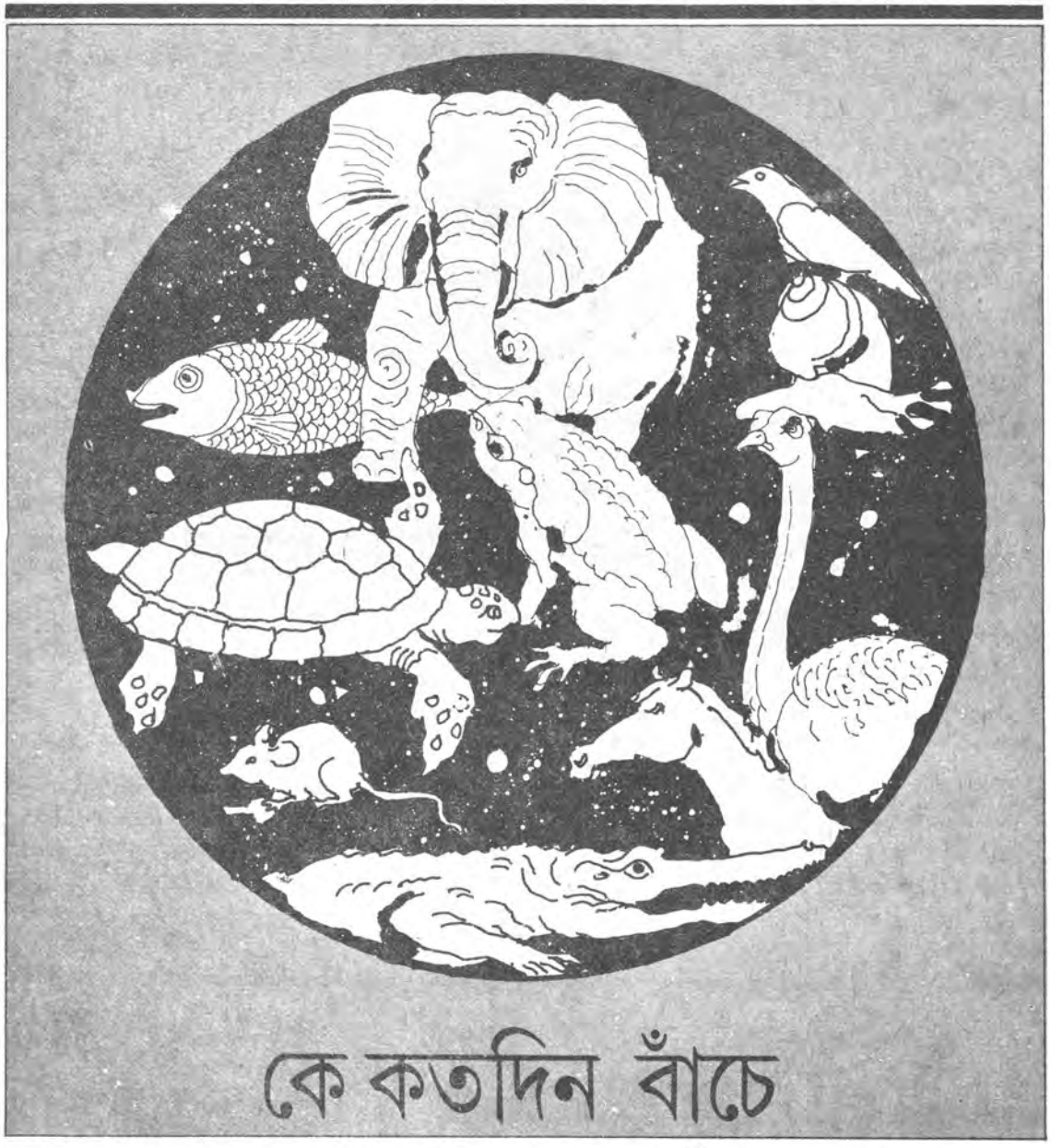

কে কতদিন বাঁচে

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান মানুষের হাতে এমন অনেক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিয়েছে যা দিয়ে চোখের নিমেষে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা যায়।

অপরদিকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মানুষকে অনেক বেশি দিন এই পৃথিবীর জল বাতাসে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছে। খাওয়া-দাওয়া, স্বাস্থ্যবিধি, সবার ওপর রোগ আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এমন সমস্ত ওষুধপত্র বিজ্ঞান মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে যে,মানুষ এখন আর চল্লিশে মোটেই বুড়ো হয় না বরং ষাট বছরেও যুবক থাকে।

১৮৪১ থেকে ১৯২২ এই ৮০ বছরের মধ্যে মানুষের গড় আয়ু প্রায় কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। আশি বছর আগে ছেলে ও মেয়েদের গড় আয়ু ছিল যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৮ বছর। কিন্তু ৮০ বছর পরে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৩ ও ৫৯ বছরে।

আগে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কলেরা মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যেত। কিন্তু বিজ্ঞানের দৌলতে এখন ম্যালেরিয়া ও বসন্ত দেশ থেকে প্রায় উঠেই গেছে। কলেরা যদিও হয় তবু ব্যাপক আকারে মহামারীর রূপ নেবার সুযোগ পায় না। তাছাড়া আগেকার দিনে আঁতুড় ঘরেই বহু শিশু মারা যেত। কিন্তু এখন উন্নত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার ফলে এবং আধুনিক ওষুধপত্রের কল্যাণে শিশু-মৃত্যুর হারও গেছে অনেক কমে।

এখন কেউ যদি কোন রকমে প্রথম ১৫ বছর বেঁচে থাকতে পারে তাহলে ছেলে হলে আর ৫০ বছর এবং মেয়ে হলে আরও ৫৫ বছর বেঁচে থাকার আশা করতে পারে। যদি কেউ ৬৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে তবে ছেলে হলে আরও ১২ বছর এবং মেয়ে হলে আরও ১৫ বছর বাঁচার আশা করতে পারে। কেউ যদি ৮৫ বছর বয়সেও টিকে যায়,তবে সে আরও ৪/৫ বছর বাঁচবে বলে আশা করা চলে।

বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে মানুষকে দীর্ঘজীবী করেছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য জন্তু জানোয়ার বা পশুপক্ষীর বেলায় এর ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। আমাদের আধুনিক চাষবাস, কলকারখানা, যাতায়াত, সমস্ত কিছুই পশুপক্ষীদের জীবনযাত্রার পক্ষে ক্ষতিকর।

চাষবাসে আমরা এখন যে সব কীটনাশক ব্যবহার করি,তার ফলে কত রকমের পোকামাকড়, প্রাণী যে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হতে চলেছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারবে।

পাখীরাতো আর বুঝতে পারে না তারা ক্ষেত থেকে ঐ সমস্ত কীটনাশক মেশা শস্য খায়! এর ফলে তারা যখন ডিম পাড়ে, তখন সেই ডিমের খোসা আর যথেষ্ট শক্ত হয় না। যখন ডিমে তা দিতে বসে তখন ডিম সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে যায়। ডিম ফুটে আর বাচ্চা বেরোতে পারে না। এই কারণে অনেক রকম পাখী অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়ে বসে আছে।

ধর যে সব সুন্দর সুন্দর ফড়িংকে আমরা ঘাসে ঘাসে উড়ে বেড়াতে দেখি তাদের কথা। এই সব ফড়িং-এর জীবন মাত্র কয়েক ঘন্টার। তাই বলে ফড়িংদের সত্যিকার আয়ু কিন্তু এত কম নয়। লার্ভা হিসাবে এক, দুই কিংবা তিন বছর জলে কাটিয়ে তবে তারা ফড়িং হিসাবে ডাঙায় ওড়ে। কিন্তু কলকারখানার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং বৃষ্টির জলে ধুয়ে আসা কীটনাশকে নদী, নালার জল দূষিত হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ ফড়িং আর লার্ভা জলেই মরে যায়। ফড়িং হবার সুযোগ পায় না।

এবার এই সমস্ত পশু-পাখীরা কে কতদিন বাঁচে তার একটা মোটামুটি হিসেব নীচে দেওয়া হল।

মাছি	৫	সপ্তাহ	ঝিনুক	১২	বছর	তিমি	৪০	বছর
গঙ্গাফড়িং	৬	মাস	কুনো ব্যাঙ	১৫		কুমীর	৫৬	,,
শজারু	২	বছর	ময়াল সাপ	২৩		রাজহাঁস	৭০	
নেংটি ইঁদুর, ব্যাঙ	৬		বাঘ	২৫		হাতী	৭০	
কাঁকড়া, শামুক	৯		ঘোড়া	২৫-৪০		হাঙর	১০০	
কুকুর	১০-১৫	,,	দাঁড়কাক	২৬-৬৯		পোনা মাছ	১৫০-২০০	
বেড়াল	১০-২০	,,	শিম্পাঞ্জী	৩০		কচ্ছপ	২০০	
						ওক গাছ	১৫০০	

মেঘ-বৃষ্টির লুকোচুরি

অপরাজিত বসু

এই সেদিন পাড়ার ছেলেরা কৌটো বাজিয়ে পিকুদের বাড়ি থেকে খরাত্রাণে চাঁদা নিয়ে গেল। বাবা সকালে বাড়িতেই থাকেন, দাড়ি কামানোর মাঝপথে উঠে এসে দীপকদার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার অবস্থা নাকি সঙ্গিন, গ্রাম-বাংলা জ্বলছে। টাকা নিয়ে দীপকদারা চলে যেতে পিকু বাবাকে জিজ্ঞেস করে,

–খরা কি বাবা?

–খরা? বর্ষাকালে বৃষ্টি না হওয়াকে খরা বলে।

–খরা হলে কি হয়?

–বাঃ, বৃষ্টি না হলে চাষবাস হবে কি করে? আমরা খাবো কি?

–কিন্তু আকাশে কত মেঘ, বৃষ্টি হয়না কেন?

–তা তো আমি বলতে পারি না, তোর কাকাকে জিজ্ঞেস করিস।

–পিকুর কাকা আলিপুরের হাওয়া অফিসে চাকরি করে। বিজ্ঞানী না কি যেন। ঝড়, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি– সব কিছুর খবর পেতে হলে সবাই হাওয়া অফিসে খোঁজ করে। পিকু দেখেছে, খবরের কাগজে বা রেডিওতে আলিপুর হাওয়া আপিস থেকে ঝড়-বৃষ্টির আগাম খবর বলা হয়।

সন্ধেবেলা ছোটকাকা অফিস থেকে ফিরে বিশ্রাম করছে। এমন সময় পিকু গুটি গুটি এসে হাজির।

–খরা কি কাকু?

–কেন রে? হঠাৎ খরা?

–জানো না, আজ সক্‌কালে খরার জন্য চাঁদা নিয়ে গেছে।

–তাই নাকি? তাহলে তো বলতেই হয়। শোন, ঠিক মতো বৃষ্টি না হওয়াকে খরা বলে।

এই ব্যাপারটা পিকু কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে জানে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আকাশে তো কত মেঘ ঘুরে বেড়ায়। কোনটা ভারতের ম্যাপের মতো, কোনটা আফ্রিকার সিংহের মতো। সাদা সাদা ফুলো ফুলো, তার ফাঁক দিয়ে ঐ দূরের নীল আকাশও দেখা যায়। তাদের স্লাসের নীলুটা এত দুষ্টু। একবার একটা মেঘ দেখিয়ে বলেছিল, ঐ দ্যাখ হেডস্যারের মাথা। সে ছোটকাকার কথা মানতে পারে না।জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে,

–আকাশে তো কত মেঘ, বৃষ্টি হবে না কেন?

–সব মেঘে বৃষ্টি হয়না রে বোকা। আকাশে প্রায় বারো রকমের মেঘ দেখা যায়, তা জানিস? পেঁজা তুলোর মতো স্তূপ মেঘ আকাশে ঘুরে বেড়ায়, এ

আমাদের কলকাতা

আমাদের কলকাতা সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে ভুল ধারণা এই যে জোব চার্ণক নামে এক সাহেব এই শহরটার পত্তন করেছিলেন। জোব চার্ণকের বহু আগে কলকাতা যে ছিল তার প্রমাণ ইতিহাসের পুঁথিপত্রে আছে। তবে ইংরেজ আমলে কলকাতার উৎপত্তি জোব চার্ণক থেকে ধরা যেতে পারে।

সেই চার্ণক সাহেব ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এখানে ঘাঁটি গাড়লেন। যদিও এই জায়গাটা খুব উপযুক্ত ছিল না তবে ফরাসী পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজদের থেকে দূরে থাকবার জন্য তিনি নদীর এপারে ব্যবসা শুরু করলেন।

তারপরে এই শহরটার ওপর দিয়ে অনেকরকম ঝড় ঝাপ্টা গেছে। এক সময় নবাব ইংরেজদের এখান থেকে হাটিয়েও দিয়েছিলেন।

যাই হোক ইংরেজরা শাসক হিসেবে যখন এখানে ক্ষমতা বিস্তার করলেন, তখন তাঁরা এই জায়গাটাকেই রাজধানী করে নিলেন। কিন্তু রাজধানী শহর হলে হবে কি, তাঁরা কেবল নিজেদের এলাকাটাকেই ভাল করে গড়ে তুললেন। দেশীয় বা নেটিভরা কি ভাবে থাকবে সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। এর মানে হল যে কলকাতা শহরটা খুব অনুপযুক্ত জায়গায় স্থাপিত হয়েছে কেন না এর পেছনে জলাভূমি। স্বাভাবিক জল নিকাশী ব্যবস্থাও এখানে ছিল না। আর তারপর যেটুকু বা শহরটা তৈরী হল, সেটা সাহেবদের প্রয়োজন মেটাতে এবং ভবিষ্যতের দিকে একেবারে দৃষ্টি না দিয়ে।

তার ফলেই আজকে কলকাতা শহরে এত দূরবস্থা। অবশ্য এর মাঝে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, দাঙ্গা এবং দেশ বিভাগেরও বিষময় ফল এই শহরটাকেই ভোগ করতে হয়েছে।

৯২

৪0

আলপিন থেকে আলপস্ পর্বত-সবরকম খবর, সংগে উপন্যাস, গল্প, কবিতা আর হাজার মজা নিয়ে প্রতি মাসে বেরুচ্ছে 'সবজান্তা মজারু'। বাংলা ভাষায় এরকম কাগজ আর হয়নি। বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যা সমেত পরের বারো মাসের 'সবজান্তা মজারু' পেতে হলে ব্যাংক ড্রাফটে, পোস্টাল মানি অর্ডারে বা নগদে 40 টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে ৮০ টাকা) নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। তার সংগে নাম ও ঠিকানা।

শ্রম, ১৩ কিড স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬

থেকে বৃষ্টি হবে না। আবার বর্ষাকালে জলভরা কালো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়, এ হল বর্ষার মেঘ। তাছাড়া ধর, খুব উঁচু আকাশে মেয়েদের মাথার ছড়ানো চুলের মতো এক ধরনের মেঘ দেখা যায়। চষা ক্ষেতের এবড়ো খেবড়ো মাটির মতো আকাশে দলা দলা মেঘ ছড়িয়ে থাকে, আবার উঁচু দিকে পাতলা চাদরের মতো দেখতে এক রকম মেঘ দেখা যায়। তবে সব মেঘেই জল আছে।

–সব মেঘে যদি জল থাকে তাহলে সব মেঘে বৃষ্টি হবে না কেন?

–তুই দেখছি খুব চালাক হয়েছিস। ছোটকাকা হেসে ফেলে। আচ্ছা বল, আকাশে মেঘ আসে কোথা থেকে?

–আমি জানি, আমি জানি। পিকু জোরে হাততালি দিয়ে ওঠে। তারপর গড় গড় করে পড়া বলার মতো বলে যায়, সূর্যের উত্তাপে খাল বিল সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প উঠে মেঘ তৈরী করে।

–ঠিক। ছোটকাকা পিকুর পিঠ চাপড়ে দেয়। তারপর বলে, সূর্য যে তাপ পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে, তার খুব অল্পই বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে আসতে পারে। সূর্যের তাপের একটা অংশ বায়ুমন্ডল শোষণ করে, একটা অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যায়। আবার আমাদের দেশে যতটা তাপ পড়বে, রাশিয়াতে ততটা পড়বে না, কারণ বিষুব রেখার কাছাকাছি আছি বলে সূর্য আমাদের দেশে খাড়াই ভাবে তাপ দেয়, কিন্তু রাশিয়া তো উত্তর মেরুর কাছাকাছি দেশ, ওখানে সূর্য হেলিয়ে পড়ে কিরণ দেবে। তার মানে বিষুব রেখার চারপাশের দেশের জলাভূমি, নদী, সমুদ্র থেকে সূর্যের তাপে জল তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে আকাশের মেঘ হবে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি না হলে খাড়াই সূর্যের জন্য খুব গরম হবে–এক কথায় চরম আবহাওয়া। একে আমরা 'ট্রপিকাল ওয়েদার' বলি। খুব গরম পড়ে বলে এই সব দেশের লোকেরা দেখতে কালো কালো। আবার ধর, ইউরোপের আবহাওয়ায় শীতের প্রাধান্য বেশী, বরফ পড়ে, ওদের গরমকালটা ছোট, এবং মৃদু। তাই ওদের গায়ের রঙও সাদা।

–তাহলে তুমি বলছো আমাদের দেশে ঝড় বৃষ্টি বেশি হয়। কই হচ্ছে–এবার তো বেশ খরা।

–হ্যাঁ, এক আধবার কম বৃষ্টি হয়ে খরা হলেও গড়পড়তা আমাদের দেশে বেশি বৃষ্টি হয়। এই ধর না চেরাপুঞ্জী। মেঘালয়ের এই জায়গাটা পৃথিবীতে যতগুলি ভারী বৃষ্টিপাতের জায়গা আছে তার মধ্যে একটা। যা বলছিলাম, সূর্যের তাপে জল তো বাষ্প হল। এখন হল কি, জলীয় বাষ্প বাতাসের চেয়ে হালকা। তাই বাষ্প ভাসতে ভাসতে ঠেলে ওপরে চলে যায়, সেখানে গিয়ে মেঘের আকার নেয়। আজ যে আমরা মেঘের নানান নাম দিয়েছি, আগেকার লোকেরা তা জানতো না। আজ থেকে মাত্র একশ পঞ্চাশ বছর আগে লন্ডনের এক ওষুধের কারবারী লিউকে হাওয়ার্ড মেঘেদের নাম দিয়েছিলেন। ওষুধের কারবারী হলেও লিউকের আবহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর স্বভাব ছিলো। জানিস তো, ইংল্যান্ডে দিনরাত মেঘলা, স্যাঁতসেঁতে, কুয়াশা থাকে। তাই ইংরেজরা খুব আবহাওয়া সম্বন্ধে সচেতন জাত।

–কিন্তু কাকু, জলীয় বাষ্পের তো কোন রঙ নেই, তাহলে মেঘকে সাদা দেখায় কেন?

–জলীয় বাষ্প যখন মেঘ হয়, তখন ঠিক ঠিক জলীয় বাষ্প থাকে না। একটা কথা জানিসতো, যত ওপরে যাবি ঠান্ডার দেশ, এভারেস্টের চূড়ায় তো কন্‌কনে শীত। বৃষ্টি ফিষ্টি যা কিছু তা বায়ুমন্ডলের নীচের স্তরের মধ্যে হয়। ওপরে গেলে শুধু ঠান্ডা বাড়ে তাই নয়, বাতাসের চাপও কমে যায়। যেমন ধর, সমুদ্রের ওপরে যেখানে এক লিটার বায়ুর ওজন ১.৩ গ্রাম, সেখানে এভারেস্টের চূড়ায় এক লিটার বায়ুর ওজন মাত্র 0.8 গ্রাম। আর এক হাজার ফুট করে উঁচুতে উঠলে বাতাসের উষ্ণতা ২° সেলসিয়াস করে কমে যায়। ওপরে গিয়ে হালকা চাপের জন্য জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয়। জলকণাগুলি এত ছোট যে তারা সহজেই উঁচু বাতাসে ভাসতে পারে। জলকণা গুলি শীতল হতে হতে এক সময় অতিরিক্ত শীতল হয়ে পড়ে। যেমন ধর–২০° সেলসিয়েস বা ৩৫° সেলসিয়াস উষ্ণতায়ও জলকণা ভাসতে দেখা যায়। বাতাসে সব সময় সূক্ষ্ম ধুলোর কণা থাকে, তাছাড়া সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে আসার সময় মিহি নুনের গুঁড়ো তুলে নিয়ে আসে। এইগুলোকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প জমে জলকণা, পরে বরফকণার রূপ নেয়। সাদা সাদা রাশি রাশি বরফের কুচি, শীতল জলকণা–এই সব মিলে উঁচু আকাশে মেঘের আকার নেয়। কণাগুলির ব্যাস এক সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের সমান হয়।

–মেঘের মধ্যে যে জলের কণা আছে, বরফের কণা আছে তা তোমরা জানলে কি করে? তোমরা কি গিয়ে

দেখে এসেছ? পিকুর ছোটকাকা এবার হেসে ফেললো। তারপর বললো,

–না রে, বিজ্ঞানীদের সব কিছু গিয়ে দেখে আসতে হয় না। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করেও অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়। যেমন ধর, ১৮৯৭ সালে উইলসন সাহেব একটা ক্লাউড চেম্বার বা মেঘের বাক্স তৈরি করে দেখিয়েছিলেন। পরে এই ক্লাউড চেম্বার দিয়ে পরমাণু গবেষণার অনেক কাজ হয়েছিল। যাই হোক, যা বলছিলাম। ছোট ছোট জলকণা জমে বড় বড় জলের ফোঁটা হয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু পড়তে শুরু করলেই যে তা মাটি ছোঁবে তা মনে করিস না। নিচের বাতাস গরম বলে মাটি ধরার আগেই আবার বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যেতে পারে। মরুভূমিতে হামেশাই তা ঘটে। বর্ষাকালে জলভরা মেঘ নিচ আকাশ দিয়ে বয়ে যায়। এগুলো জমে গিয়ে সহজেই বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়তে পারে। বৃষ্টির ধরনটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। কখনো মুষলধারে, কখনো ছিপছিপে একটানা, কখনো ইলশেগুঁড়ি, কখনো শিলাবৃষ্টি, কখনো বা বরফপাত। গরম বাতাস ঠান্ডা বাতাসে ঢুকে পড়লে এক ধরনের বৃষ্টি হবে, আবার ঠান্ডা বাতাস যদি গরম বাতাসে মাথা গলায় তাহলে বৃষ্টির চেহারা হবে অন্য। বৃষ্টি কি এক রকমের রে?

–কাকু, শিশির পড়ার কথা বললে না?

–ওটা হল তোর ভুল। শিশির আর বৃষ্টি এক নয়, যদিও দুই-ই বাতাসের জলীয় বাষ্প জমে হয়। শীতের রাতে ঘাসের ডগা, গাছের পাতা, টিনের চাল ঠান্ডা হতে হতে এত ঠান্ডা হয়ে যায় যে তার গায়ের লাগোয়া বাতাসের জলীয় বাষ্প বিন্দু বিন্দু হয়ে জমে লেগে থাকে। একে আমরা শিশির বলি। শিশির পড়া না বলে আমাদের শিশির জমা বলা উচিত।

–আর বরফ পড়ার ব্যাপারটা?

–হ্যাঁ, তাও হতে পারে। যখন খুব ঠান্ডা পড়ে, বিশেষ করে যখন উষ্ণতা জলের হিমাংকের নিচে চলে আসে, বাতাসের আদ্রতা কম থাকে, ঝোড়ো হাওয়া থাকে না, তখন বৃষ্টি না পড়ে পেঁজা তুলোর মতো বরফ পড়ে। মনে নেই, সেবার মুসৌরিতে বেড়াতে গিয়ে আমরা কেমন বরফ পড়া দেখেছিলাম?

–হ্যাঁ, কাকু মনে আছে। বরফের কুচিগুলো শুকনো ছিল। কোটের ওপর পড়ে মোটেই গলে যায়নি। বলেই পিকুর কালবৈশাখীর শিলাবৃষ্টির কথা মনে পড়ে যায়। বলে ওঠে,

–কাকু, শিলাবৃষ্টি কেন হয়?

–ঠিক, শিলাবৃষ্টি আর এক রকমের বৃষ্টি। কোন কারণে বাতাস যদি হঠাৎ বেশী ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে বরফের কুচোগুলো জমে বড় বড় মার্বেল-

গুলির মতো দেখতে হয়। বরফের শিলাগুলি নিচে পড়তে পড়তে বাতাসের তোড়ে আবার ওপরে উঠে যায়। সেখানে ঠান্ডা পরিবেশে আরো কিছুটা বরফ তার ওপর জমে ওঠে। এইভাবে বার বার নিচে নামা, তারপর ওপরে ওঠার ফলে বরফের শিলাটা বেশ ভারী আর বড় হয়ে একসময় মাটিতে আছড়ে পড়ে। যদি কখনো বড় শিল পাস তো ভেঙে দেখিস কতগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের দাগ আছে। এগুলো হল বারে বারে বরফ জমার প্রমাণ। সবচেয়ে বড় শিল পড়েছিল উত্তর আমেরিকায় নেব্রাস্কাতে। শিলটার ওজন ছিল প্রায় সাড়ে সাতশো গ্রাম আর ব্যাস ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। ভেবে দেখতো, ওটা যদি কারো মাথায় পড়তো কি হত! নে, অনেকক্ষণ বক বক করেছি, এবার আমাকে রেহাই দে।

—না কাকু, আর একটা কথা। তাহলেই শেষ। মেঘ থেকে কোনমতে বৃষ্টি নামানো যায় না? তোমরা করছো কি?

—ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। যতই বলি, ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ-রোদের ব্যাপার স্যাপার এখনো আমরা ততো ভালো বুঝি না। তবে চেষ্টা হয়নি বা হচ্ছে না তা নয়। মানুষ বহুদিন ধরে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। যখন বিজ্ঞান তেমন উন্নত হয়নি, তখনো অনাবৃষ্টির সময় মানুষ পুজোআচ্চা থেকে শুরু করে ধোঁয়া দিয়ে দিয়ে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করেছে। আসলে মেঘের জলকণাগুলি জমিয়ে বড় করে তোলাটাই সমস্যা। জলাকণাগুলিকে জমতে হলে কোন কিছুকে আশ্রয় করে বড় হওয়া দরকার। ফরাসী যন্ত্রকুশলী কুলিয়ার ১৮৭৫ সালে একটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন কিভাবে বৃষ্টির জলের মধ্যে ধুলোকণার কেন্দ্র আছে। কৃত্রিমভাবে মেঘের মধ্যে কোনো কোনো লবণের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টি নামানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৬ সালে ভন্নেগুট নামে এক বিজ্ঞানী এরোপ্লেনে চড়ে মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডাইডের গুঁড়ো ছড়িয়ে বৃষ্টি নামিয়ে ছিলেন। সিলভার আয়োডাইডের বদলে লেড আয়োডাইড, ভ্যানাডিয়াম পেন্টোক্সাইড, কিউপ্রিক সালফাইড ও আরো অনেক কিছু ব্যবহার করা হয়েছে। হলে কি হবে, এখনো তেমন মনোমতো ফল পাওয়া যায়নি।

ব্যস আর না। যা, এবার পড়তে বস। বলে ছোটকাকা তাসের আড্ডায় যাবার জন্য পাঞ্জাবিটা মাথায় গলালো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে চটি ফট ফট করতে করতে সটান নেমে গেল।

।। জলের আর এক নাম জীবন।।

এই কলকাতা মহানগর কত বড় তা তোমরা জান তো? শহর কলকাতার সীমা ছাড়িয়ে কল্যাণী থেকে বজবজ পর্যন্ত আমাদের কলকাতা ছড়িয়ে রয়েছে। সবটা নিয়েই বৃহত্তর কলকাতা বা সি এম ডি (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট)। আয়তনে ১৪৫০ বর্গ কিলোমিটার।

এই বিশাল এলাকায় বর্তমানে ১ কোটি ৩ লক্ষ লোকের বসবাস। এই সমস্ত মানুষের প্রয়োজনীয় জল যোগানোর দায়িত্ব কত বিরাট ভেবে দেখ। সি এম ডি এ-র যখন জন্ম হল (১৯৭০) তখন কলকাতাবাসীর জন্য জল সরবরাহ করবার একটাই উৎস ছিল। সেটা হল কলকাতা কর্পোরেশনের পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস। কিন্তু সেতো একশ' বছরের পুরোনো মান্ধাতার আমলে তৈরী। তাই তার জল দেবার ক্ষমতাও একশ'বছর আগের কলকাতার লোকসংখ্যার হিসেবে। জলে হাত দেবার আগে সি এম ডি এ প্রথমে এই প্রায় অথর্ব প্রকল্পটির সংস্কার করে তার জল সরবরাহ ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ (৮ কোটি গ্যালন থেকে ১৪ কোটি গ্যালন) বাড়ালো। কিন্তু চাহিদার কথা ভেবে, খুব বড় বড় দুটো জলপ্রকল্প তৈরীর কাজ শুরু হল। তার মধ্যে ৬ কোটি গ্যালনের গার্ডেনরীচ জলপ্রকল্পটির উদ্বোধন গত বছর হয়ে গেছে। অন্যটি ৪ কোটি গ্যালনের প্রকল্প হাওড়ায়। সেটাও শেষ হবার মুখে। এছাড়া পরিস্রুত জল এনে জমা করে রাখার জন্য ভূগর্ভস্থ দুটি জলাধার নির্মাণ আরম্ভ হল। একটা অকল্যান্ড স্কোয়ারে কাজ সম্পূর্ণ। অন্যটি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে তৈরীর কাজ চলছে। আগামীদিনে বরানগর-কামারহাটিতে ৩ কোটি গ্যালনের একটি প্রকল্প চালু হবে। আর আছে গভীর নলকূপ খুঁড়ে জল সরবরাহের কাজ। ১৯৭০ সালের আগে কলকাতার বাসিন্দাদের মাথাপিছু জলের যোগান ছিল দৈনিক ২০/২২ গ্যালনের মত। আজ তা দাঁড়িয়েছে ৪০ গ্যালনে। কিন্তু লোক যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে চাহিদা। কাজেই কাজ চলতেই থাকবে। পুরোনো পাইপগুলির মেরামত, নতুন পাইপ বসানো ইত্যাদি কাজও চলতে থাকবে। এ পর্যন্ত জলের জন্য সি এম ডি এ খরচ করেছে ১০০ কোটি টাকার মত; আগামী ৫ বছরে খরচ হবে আরও ৫০ কোটি টাকা।

এর থেকেই বুঝতে পারবে জলের ওপর কত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জলের আরেক নাম তো জীবন।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

রোবটের নাম ব্যোমশঙ্কর

টুকু-বুকুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে, ব্যোমশঙ্কর। ব্যোমশঙ্করের এক বদস্বভাব রাস্তায় বেরিয়ে, যা দেখবে তাই কেনার জন্য বায়না ধরবে।

কথা ■ সম্রাট চৌধুরী/ছবি ■ ধীরেন শাসমল।

টুকু-বুকু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝালমুড়ি কিনে দেয়, কারন ব্যোমশঙ্করের সঙ্গে না থাকলে মা-বাবা রাস্তায় বেরোতে দেবেনা।

ব্যোমশঙ্করকে ওরা সববেলুন কিনে দেয়, কিন্তু বেলুন-গুলো হাতে ধরা মাত্রই ব্যোমশঙ্কর আকাশে উঠে উড়তে শুরু করে। রাস্তায় টুকু-বুকু ওর পেছনে ছুটে চলে।

ওদিকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফাইনস্টাইন বাড়ীর ছাদে বসে এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুরু করেছেন। সঙ্গে ওঁর অ্যাসিট্যান্ট ফিস্টটন।

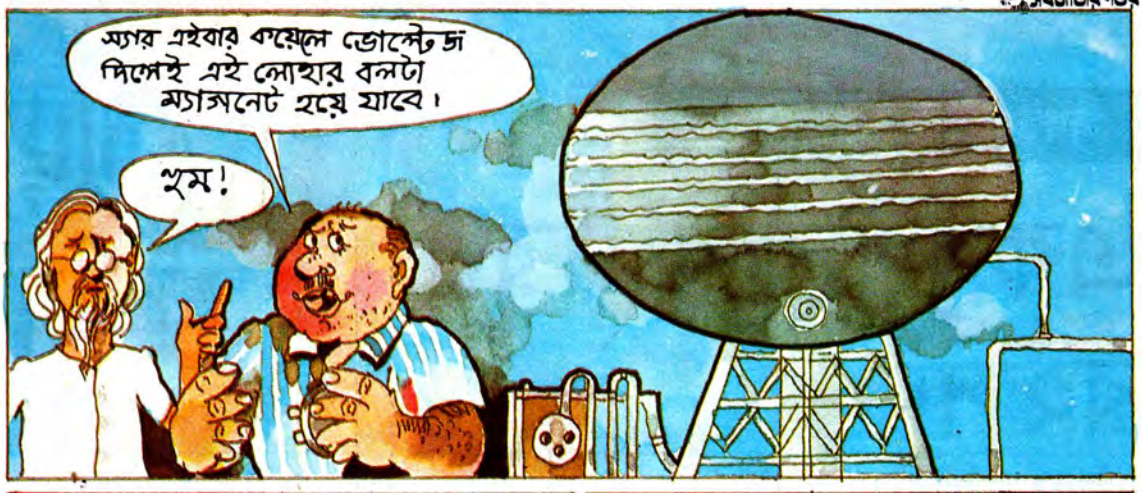
স্যার এইবার কয়েল ভোল্টেজ দিলেই এই লোহার বলটা ম্যাগনেট হয়ে যাবে।
হুম!

ফিল্ডটন লোহার বলে ভোল্টেজ দেয়।

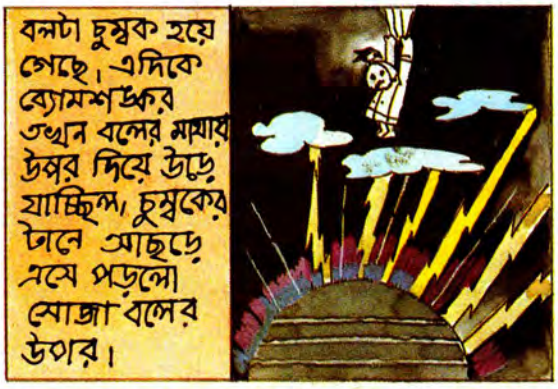
বলটা চুম্বক হয়ে গেছে। এদিকে ব্যোমশঙ্কর তখন বলের মায়ার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, চুম্বকের টানে আছড়ে এসে পড়লো লোহার বলের উপর।

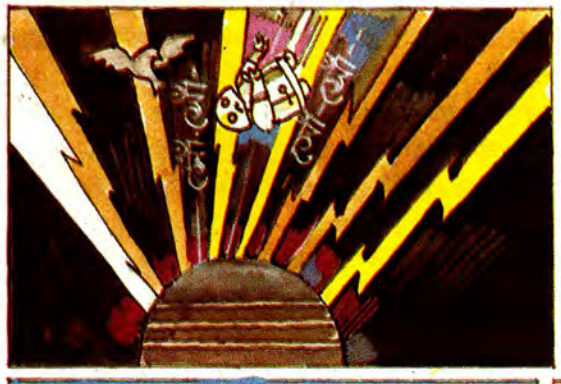

স্যার! স্যার! সেন্সেশনাল ব্যাপার, এ নির্ঘাৎ অন্য গ্রহের মানুষ!
হুম! কার্ভেচার অফ স্পেস।

স্যা-স্যার, আমার প্রান বাঁচানোর জন্য অ-অনেক ধ-ধ-ধন্যবাদ।

খুঁড়াতে খুঁড়াতে টুকু-বুকু সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে ফাইনস্টাইনের ছাদে।
শঙ্কুদা! ঢের হয়েছে, চলো বাড়ী ফেরা যাক।

সবজান্তার সরঞ্জাম-৬

একমুখীকরণের রহস্য

নিজে করে দেখো

অরিজিৎ বসুরায়

গতবারে তোমরা একমুখীকরণ ব্যাপারটার সংগে পরিচিত হয়েছ. কিন্তু কি করে প্রত্যাবর্তী প্রবাহের একমুখীকরণ করা যায়, সেটা খানিক না জানাই রয়ে গেছে।গতবারে কাজ করার ব্যাপারটায় আমরা রীতিমত ফাঁকি দিয়ে ফেলেছি। কাজেই এবারে প্রথমেই একটা কাজ করে ফেল। চারখানা ডায়োড দিয়ে নীচের মতো একখানা সার্কিট তৈরী কর।

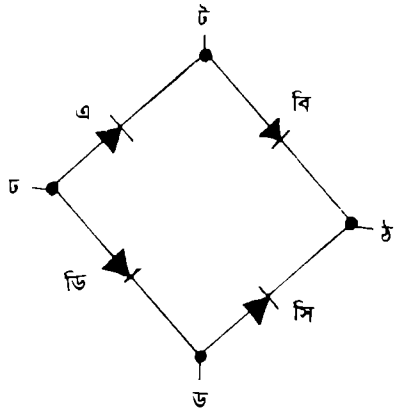

ডায়োডের অভিমুখগুলো ঠিক ছবির মতো রাখতে ভুলো না।

এই সহজ সরল দেখতে সার্কিটটাই হল একমুখী কারক বর্তনী। একে রেকটিফায়ার ব্রীজও বলতে পার। এই একমুখী কারক বর্তনীটিকে নীচের মতো করে ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারীর সংগে জুড়ে দাও। আর ট্রান্সফর্মার বলতে কিন্তু আমাদের সেই পুরনো সংগীটিই।

এখন তোমরা নিশ্চই জান যে প্রত্যাবর্তী প্রবাহে প্রতি আবর্তনে একবার প-এর ভোল্টেজ ফ-এর তুলনায় ধনাত্বক হচ্ছে, আবার পরমূহুর্তেই প-এর ভোল্টেজ ফ-এর তুলনায় ঋণাত্বক হচ্ছে। কথাটাকে একটু অন্যরকম ভাবে বললে বলতে পারি। যদি প্রতি আবর্তনের অর্ধেক সময় ফ প্রান্তে, বাকি অর্ধেক সময় প প্রান্তের ভোল্টেজের মান শূন্য ধরি, তাহলে যথাক্রমে একবার প ফ এর তুলনায় ধনাত্বক হবে এবং পরমূহুর্তেই ফ প-এর তুলনায় ঋণাত্বক হবে এবং এই

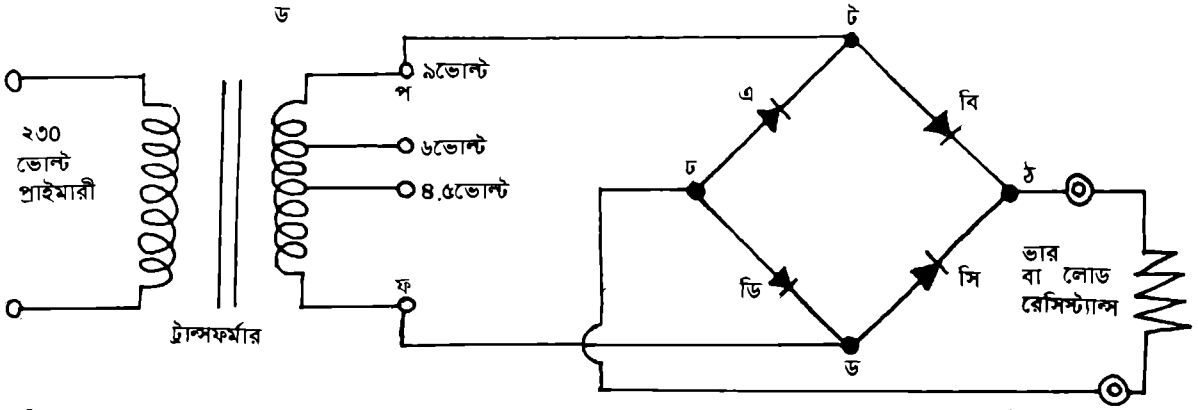

ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে।

এখন ধর, যে কোন মুহূর্তে ফ-এর মান শূন্য এবং প ধনাত্মক। তাহলে ওপরের বর্তনীর দিকে তাকালে দেখব যে প্রবাহ প থেকে ফ তে প্রবাহিত হবার জন্য ট প্রান্তে এসে—'বি' ডায়োডের সম্মুখ ধ্রুবণ এবং এ ডায়োডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঠ প্রান্তে উপস্থিত হোল। এখন দুটো পথ খোলা—সি ডায়োড এবং রোধ (যাকে এখানে লোড বা ভার বলা যেতে পারে)। এখানে রোধের বদলে একটা রেডিও কিংবা আলো অথবা খেলনার মোটরও হতে পারে। এখন যেহেতু ঠ-এর ভোল্টেজ ফ-এর তুলনায় ধনাত্মক সি ডায়োডটার বিপরীত ধ্রুবণের জন্য ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রাবাহিত হতে পারবে না, প্রবাহিত হবে লোড বা বোঝার মধ্য দিয়ে। ঢ বিন্দুতে এস, ডি ডায়োডের মধ্য দিয়ে ড হয়ে ফ বিন্দুতে ফিরে আসবে এবং প্রবাহ বর্তনীটা পূর্ণ করবে। এর ফলে আমরা দেখলাম যে ভারের দুই লক্ষ্য করে দেখ যে, এবারেও বোঝার দুই প্রান্তে উৎপন্ন ভোল্টেজের ঠ প্রান্ত ধনাত্মক এবং ঢ প্রান্ত হবে শূন্য বা ঠ এর তুলনায় ঋণাত্মক।

তাহলে একমুখীকরণ করার ব্যাপারটা বোঝা গেল। এখন আমরা ঠ প্রান্ত এবং ঢ প্রান্তকে যথাক্রমে পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্ত বলতে পারি। এই দু প্রান্তর মধ্যে কোন লোড বা ভার যুক্ত করলে তড়িৎ সবসময় ঠ থেকে ঢ-এর দিকে প্রবাহিত হবে। হাতে নাতে প্রমাণ পেতে হলে নীচের মতো করে একটা ভার বা লোড তৈরী করে নাও। আগের ভার, ১০০০ ওহম বা ১ কিলো ওহ্‌ম রোধের সংগে নীচের ছবির মতো করে এল. ই. ডি দুটো লাগিয়ে নাও। এবার ক এবং খ প্রান্তকে যথাক্রমে ঠ এবং ঢ-এর সংগে যুক্ত কর। আর ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারীতে ২৩০ ভোল্ট প্রয়োগ কর। মেইন অন করলেই দেখবে এবার লাল এল. ই. ডি টা জ্বলছে কিন্তু সবুজটা জ্বলছে না।

প্রান্তে যে ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে তার ঠ প্রান্ত হবে ধনাত্মক এবং ঢ প্রান্ত হবে শূন্য বাধ এর তুলনায় ঋণাত্মক। এবার আবর্তনের পরে কি হয় দেখা যাক। কাগজের এ-সি একমুখীকরণ হয়ে গেছিল এবারেও তাই হবে কিন্তু এই ঋণাত্মক দিকটাকে উল্টে ধনাত্মক করে দেবার ব্যাপারটা সম্পন্ন করবে ডায়োডগুলো। এবার প-এর মান শূন্য ধরলে ফ-এর মান হবে ধনাত্মক এবং তড়িৎ ফ থেকে প-এর দিকে যাকে। ডি বিন্দুতে এসে প্রবাহের আবার সেই বিড়ম্বনা কোন দিকে যাবে কিন্তু এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, প্রবাহ সি ডায়োডের মধ্য দিয়ে ঠ প্রান্তে এসে ভার বা লোডের মধ্য দিয়ে ঢ প্রান্তে হয়ে এ ডায়োডের মধ্য দিয়ে প বিন্দুতে গিয়ে বর্তনী পূর্ণ করবে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর যে, প্রথমার্ধে বি এবং ডি ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রাবাহিত হয়েছিল এবং সি আর এ বাধা দিয়েছিল। এবার বি আর ডি বাধা দেওয়ার এবং সি আর এ ডায়োডর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রাবাহিত হওয়ায় ঋণাত্মক ভোল্টেজ উল্টে ধনাত্মক হয়ে গেল। কারণ

এর কারণ লাল এল. ই. ডি টির সম্মুখ ধ্রুবণ হওয়ায় জ্বলছে কিন্তু সবুজ এল. ই. ডি সব সময়ে বিপরীত ধ্রুবণে থাকার জন্য কখনই জ্বলছে না। অথচ এ-সির ক্ষেত্রে দুটো এল. ই. ডি-ই জ্বলছিল। প্রমাণ আরও জোরদার করার জন্য লোডের প্রান্ত দুটো উল্টে দাও, মানে ক-কে ঢ এবং খ-কে ঠ এর সংগে যুক্ত কর। এবার মেইন সুইচ অন করলে দেখবে সবুজ এল. ই. ডি টা জ্বলছে কিন্তু লাল এল.ই.ডি টার কোন সাড়া শব্দ নেই। তার মানে ঠ-এর ভোল্টেজ ঢ-এর তুলনায় সব সময়েই ধনাত্মক। এর পর কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে।

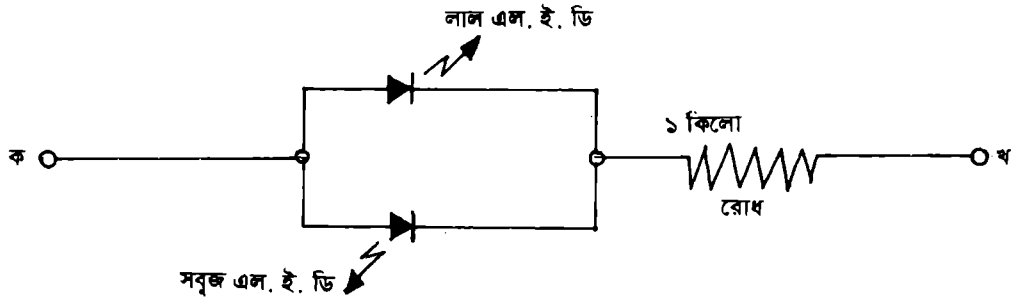

আনুমানিক দাম সহ জিনিসের একটা তালিকা দিলাম। অবশ্য কেবল দুটো জিনিসই নতুন করে কিনতে হবে। বাকি গুলো তো আগেই কেনা আছে।

রেসিস্ট্যান্স—১০০০ ওহ্‌ম বা ১ টি পঁচিশ পয়সা ১ কিলো ওহ্‌ম ১ ওয়াট

ডায়োড—আই. এন ৪০০২ ৪ টি চার টাকা।

জানো কিনা জানো

চড়াই পাখীর ডাক্তারি

গাছ, ফল, ফুল-এদের কথা মনে এলে একই সময় পাখীদের কথাও মনে পড়ে। পাখীদের জন্যইতো যেন গাছ তার পাতা ফল ফুল সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাখীদের সঙ্গে তো সেজন্যই গাছের সম্পর্ক এত বেশী। গাছ ওদের আশ্রয় দেয়, রঙিন ফুলগুলো ওদের খুশীতে মাতিয়ে রাখে আর ফল খেয়েই তো ওরা বেঁচে থাকে। গাছ ওদের বড় বিশ্বাসের জিনিস–তাই ওদের এক একজন গাছে গাছে খুশীমত এক একরকম বাসা বাঁধে, তার মধ্যে বাচ্চা বড় করে। ওরা কত নিশ্চিন্ত এখানে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ওস্তাদি দেখিয়েছে বাবুইপাখীরা–ওদের বাসা যেমন বাহারে, তেমনি ভেতরটা এত নরম ভাবা যায়না–বাচ্চাদের যাতে একটুও ব্যথা না লাগে সেইজন্য এত পরিপাটি। তবে আরও অবাক করেছে চড়াইপাখী। ওদের বাসার শতকরা আশিভাগই নিমপাতা এবং সরুসরু নিমগাছের ডাল দিয়ে তৈরী। রোগ, জীবাণু এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে কি নিখুঁত ধারণা ওদের। যাতে কোনো পোকামাকড় বাসার মধ্যে আস্তানা নিতে না পারে, সেইজন্যই এত চিন্তা ভাবনা করে নিমপাতা আর তার ডাল ওরা বাসা তৈরীর মশলা হিসেবে বেছে নিয়েছে। বাচ্চারা যখন ছোট থাকে, তখনও ওদেরকে তাজা পাতা গাছ থেকে জোগাড় করে বাসায় আনতে দেখা গেছে, যাতে বাচ্চাদের কোনো রোগের ছোঁয়া না লাগে।

প্রবাল মুখোপাধ্যায়

আঁকাআঁকি

পাখি হলো, গাছ হলো, ঘরবাড়ি হলো– এবার এসো, আকাশের গায়ে সারাদিন লেপ্টে থাকে যে সূয্যিমামা, মিটি মিটি হাসে, আলো দেয়, তাকে এঁকে ফেলি। তেমন কোন পরিশ্রমের ব্যাপার নেই।

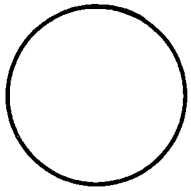

রসগোল্লা সবাই দেখেছ। খেতেও ভালোবাস অনেকে। বেশ, প্রথমেই একটা রসগোল্লা এঁকে ফেল।

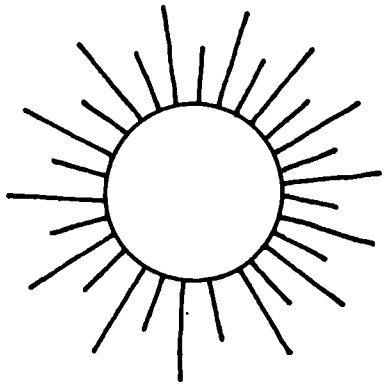

বেশ তো, গোল্লা হলো। এবার গোলের সারা গায়ে ছবিতে যেমন দেখিয়েছি, ঠিক ঠিক তেমনি দাগ টেনে যাও। একটা ছোট, একটা বড়, একটা ছোট, একটা বড়...। কেমন!

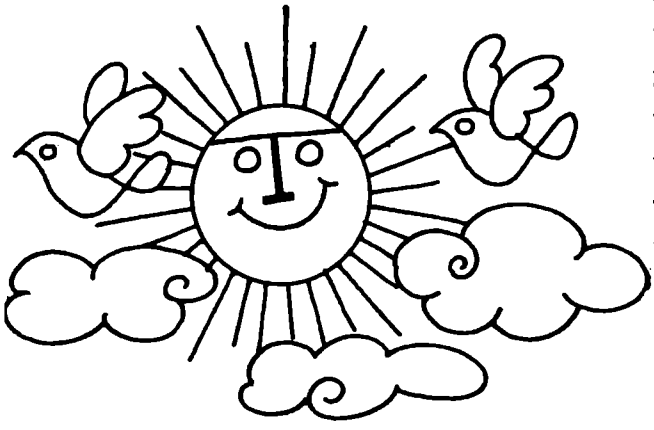

কি হলো? আলো দিচ্ছে সূয্যিমামা। এবার এসো, মামার হাসিমুখখানা আঁকি। রসগোল্লা-মার্কা মুখে কপালের এ-মোড় থেকে ও-মোড় অব্দি একটা সরলরেখা টানো। তারপর আর দুটো ছোট ছোট গোল বসিয়ে দাও–যেমনটি আছে ছবিতে। চোখ ফুটে গেল। এবার একটা অর্ধবৃত্ত আঁকো। হয়ে গেল হাসিমুখ। আকাশে সূয্যিমামা হাসছে। পাশে মেঘ। পাখি উড়ছে। কি দারুণ একটা ছবি হলো বলতো! এরপর মনের মতো রঙ লাগিয়ে দাও ছবিতে।

ছবি দেখে ছড়া লেখো

ছোট্ট টুনি গাছের পরে
বাসা বেঁধেছে,
দুষ্টু ছেলে ছানা পাড়ার
ফন্দি এঁটেছে।

ছানা পাড়ার আশায় সে যেই
গাছে উঠেছে।
টুনি মায়ের ঝট্‌পটিতে
নাকাল হয়েছে।

বে-সামালে নড়াচড়ায়
ডালটি ভেঙেছে
পাখি ধরার ফন্দিটা তার
ভেস্তে গিয়েছে।

ভাস্বতী রায়(১০)

গাছের তলায় চুপিসাড়ে
পাখী ধরার আশায়,
দাঁড়িয়ে আছে এক বেয়াদপ
চোখ দুটো তার বাসায়।

পা টিপে টিপে উঠল গাছে
ধরবে বলে পাখী,
ফুরুৎ করে পালিয়ে গিয়ে
ধাঁধিয়ে দিল আঁখি।

পরের ক্ষতি করতে গিয়ে
নিজেই পেল সাজা
ডাল, ভেঙে সে পড়ল নীচে,
রইলো কি আর তাজা!

দেবাশিস বড়ুয়া (১৩)

পূর্ণেন্দু বেতাল

দুটো আলাদা ছক—তাতে সাজানো আছে শুধুই ি-কার। দেখতে হয়েছে বরফির মত। ডান দিকের ছকের সূত্র ডানদিকে, এবং বাঁ-দিকের সূত্র বাঁ-দিকে—সাজানো আছে উল্টো পাল্টা করে। দেখতো, কত তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারো। তবে একটা কথা, নামের সঙ্গে বয়স উল্লেখ করতে ভুলো না। পুরস্কার: প্রথম পঞ্চাশজন সঠিক উত্তরদাতা—প্রত্যেকে পাঁচ টাকা।

১. পরিচয় দান
২. কোমল শাঁস যুক্ত নারকেল
৩. বাঁধানো চাতাল
৪. চালচলন
৫. অশ্বত্থ বট প্রভৃতি গাছ
৬. নিভৃত
৭. রাসায়নিক কষায় দ্রব্য বিশেষ

১. তাসের শ্রেণীবিশেষ
২. ভাগ্য
৩. বরের বালক সঙ্গী
৪. নানাভাবে চিত্রিত
৫. পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়
৬. গলে যাওয়া
৭. ক্ষমা করা হয়েছে এমন

চতুরঙ্গ

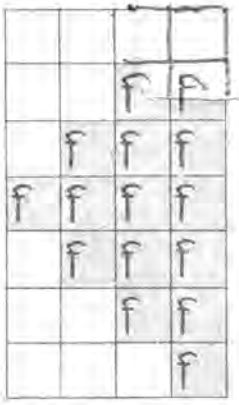

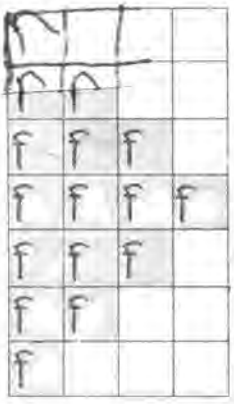

চতুরঙ্গের ষোলটা ঘরের সব অক্ষরই বর্ণানুক্রমিক-ভাবে দেওয়া রয়েছে ছকের ডানপাশে—আর সূত্র দেওয়া আছে ছকের বাঁ পাশে, তবে ছকে যেমন যেমন বসবে তেমন পর পর নয়। তবে একটা সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে—ছায়াংকিত সূত্রের উত্তর বসবে ছায়াঙ্কিত ঘরগুলোয়। প্রথম সারিতে এবং প্রথম কলমে একই শব্দ, তেমনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। উদাহরণ দেওয়া রইলো। উত্তর পাঠাবার সময়ে নামের সঙ্গে বয়স উল্লেখ করতে হবে। পুরস্কার প্রথম পঞ্চাশ জন—প্রত্যেকে পাঁচ টাকা।

ক	বে	কা	র
বে	শ	র	ম
কা	র	বা	র
র	ম	র	মা

ক	কা	কা	বা
বে	বে	ম	ম
মা	র	র	র
র	র	র	শ

১। কর্ম
২। জাঁকজমক
৩। কোনসময়ের
৪। লজ্জাহীন

যুদ্ধের পোষাক
পুরো বছর
ছুটির দিন
বন্টন

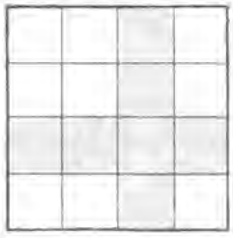

জ্ঞা	ণ	ণ	ত
বা	বা	বি	বি
ম	র	র	র
র	র	স	স

বইয়ের খবর

টাটকা বইয়ের খবর

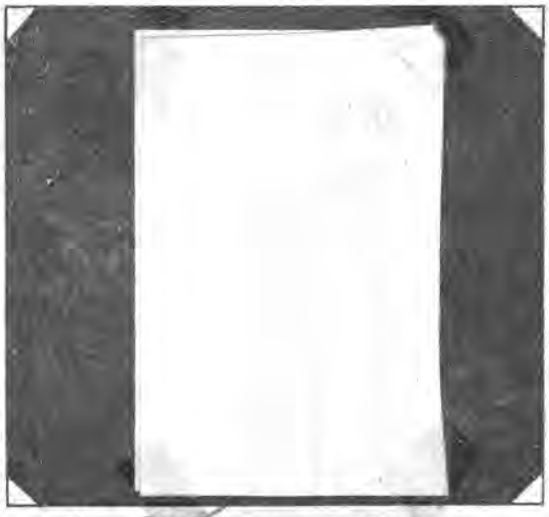

লিডার বটে পিন্‌ডিদা–আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩। দশ টাকা।

একটা নির্দিষ্ট বয়েসের কোঠায় ভেসে থাকা ছ'জন কিশোরের মাঝখানে হঠাৎই যেন পিন্‌ডিদা লিডার বনে গেল। এমনই এক ঘটনার বিন্যাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গড়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাস 'লিডার বটে পিন্‌ডিদা'।

সোনার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার মাত্র দেড় মাস বাকি। এর মাঝখানেই ঘটে গেল রক্তজল করা এক কান্ড। বর্ধমানের জমিদার বাড়ির দশ পুরুষের গোপাল মন্দির। সকাল হতেই দেখা গেল তার দরজা দুটো হাঁ করে খোলা। পুরুত ঠাকুর নিখোঁজ। আর গোপালের হীরের চোখ দুটো নেই। এই নিয়ে চারদিকে দারুণ হৈ চৈ। যে রহস্যের সূত্র অজান্তেই এসে গেল সেদিন পিন্‌ডিদার হাতে, বাদশা মহলের অন্য এক আবহাওয়ায়। তারপর রামবাদশার মতো ভয়ংকর ডাকাতের সঙ্গে মোকাবিলার এক রোমহর্ষক কাহিনীর সমাপ্তি ঘটাতে লেখক তাদের যে ভাবে দেওঘরে এনে হাজির করেছেন, সেও কম উপভোগ্য নয়। এই তিনটি টুকরো ঘটনার অসামান্য যোগসূত্রে গড়ে তোলা এই উপন্যাসটি সত্যিই অসামান্য, যা শুধু মাত্র ছোটদের নয় বড়দেরও ভালো লাগায়। সেই সঙ্গে মনে রাখার মতো ছবি আর প্রচ্ছদে সাজিয়ে তুলেছেন একালের অন্যতম শিল্পী ধীরেন শাসমল, যা পাঠকদের উপরি লাভ।

মাল্যবান রসিদ

আজগুবি–লীলা মজুমদার
নিউস্ক্রিপ্ট। দশ টাকা।

কালি কলম গল্প লেখে
রঙ তুলিতে আঁকি
কার কলমে গল্প বলে–
বলতে পার তাকি ?
ছোটর জন্যে এমন লেখা
কার সে আবিষ্কার ?
আজগুবি বই তাঁরই লেখা,
লীলা মজুমদার।

'হরিহরের হয়রানি' আর
'গুণিন', 'পুরস্কার',
'শর্টকাট' আর 'ঘুড়ি', কিংবা
'বাকির কারবার',
ভূত-বিজ্ঞান-অলৌকিক
এমনি আরো কত–
আড়াই গন্ডা গল্প আছে
সত্যি মনের মত।

দেবাশীষের মলাট, আবার
সত্যজিৎ-এর ছবি,
দশ টাকাতে এত কিছু
পাচ্ছি কিন্তু সবই।

প্রকাশনায় নিউস্ক্রিপ্ট
রতন চেনে রতনে,
প্রায় সওয়াশো পাতার বই
সাজিয়েছেন যতনে।

সুধীন্দ্র সরকার

খোশগল্প

শ্রীযুক্ত অনীশপদ দেব
সম্পাদক।

মহাশয়,

অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে আপনাদের (ব) হুল প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকা শব-যাত্রা সজারুতে আমার নামে 'কালীপদাবলী' শীর্ষক একটি ছড়া ছাপা হইয়াছে। তাহার প্রতিবাদ জানাইতে এই পত্রাঘাত। ছাপা-ইলে অধিকন্তু ন দোষায়, যৎ-পরোনাস্তি খুশী হইব। প্রথমতঃ জানাই, আমার পিতার নাম মোটেই শশীপদ নহে, উহা ভক্তি-চরণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাড়িও বারিপদ নহে, সগড়াই। শান্তি-নাথবাবুর বাড়ির কাছেই। তৃতী-য়তঃ খাওয়া দাওয়া আগে পাঁচপদ হইতো, এখন আর তিন বা চারপদের বেশী হয় না, তবে প্রতিপদেই কিছু না কিছু কাঁকর মিশ্রিত থাকে। আর জুতো নেই, ইহা ভুল কথা। আমার জুতা আছে, বেশ শক্ত, তবে প্রচুর তালি দেওয়ায় আমার বন্ধুরা উহার নাম দিয়াছে তালিপদ! কিন্তু, খালিপদ তো নহে! গানও গাহিয়া থাকি, তবে তাহা চর্যাপদ নহে, মৈথিলী। প্রিয় কবি মোটেই তারাপদ নহেন, আমার প্রিয় কবির নাম হারুণ অর রসিদ। উহাকে লইয়া একটি ছড়াও লিখিয়াছি, যদি মনোনীত হয় তাহা হইলে শবযাত্রা সজারু-র যে কোনও পাতায়, আর মনোনীত না হইলে 'খোশগল্প'*-এ ছাপাইতে পারেন। আর শেষ কথা, আমাকে লইয়া ছড়া বানাইতে যাইয়া আপনারা গোড়ায় গলদ করিয়া-ছেন। আমার নাম মোটেই কালী-পদ নহে, আমার নাম বিপদবরণ! কেমন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলাম!

ইতি
বিনীত

বিপদবরণ মাইতি
সগড়াই

* পুনশ্চ: ছড়াটি খোশগল্পেই ছাপাইবেন, খোশছড়া বলিয়া কোনও নতুন বিভাগ খুলিবার প্রয়োজন নাই।

–বিবমা।

হারুণ অর রসিদ
বলুন চট্‌পট জলদি
কোন নামটা পছন্দ?
হারুণ অর রসিদ।

পছন্দ হয় বা যদি হারুণ
বলবো তবে, চয়েস তোমার দারুণ
এই নামেতেই পদ্য লিখুন
(আর) জুল্‌ফি ধরে নাড়ুন!

তা না হয়, যদি বলেন রসিদ
তবে আমার কাব্য করাই বৃথা
বিনি পয়সায় যা ছাপছেন, আর নয়কো তাহা
ধরিয়ে দিলাম, মাল্য নয়, মূল্যবান রসিদ!

সম্পাদক
সবজান্তা মজারু
১৬ কিড স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০১৬

প্রিয় মহাশয়,

মে মাসের 'সবজান্তা মজারু'–তে স্বপনবুড়োর 'অবন ঠাকুরের অলিন্দে' স্মৃতিকথায় একটি মারাত্মক ভ্রম লক্ষ্য করলাম। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ির তিন ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, মধ্যম সমরেন্দ্রনাথ, এবং কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ। অথচ লেখা হয়েছে, 'বড় ভাই সমরেন্দ্রনাথ, রাজার মতো চেহারা–রবি ঠাকুরের নাটকে রাজা সাজেন। ..... মেজভাই গগনেন্দ্রনাথ তুলি চালিয়ে কাগজের ওপর কতকগুলি কাকের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন' ইত্যাদি। আসলে রাজার মতো চেহারা ছিল গগনের–রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজার পার্ট প্রায় তাঁর বাঁধাই ছিল। তবে অভিনয়ে আর দু-ভাইও ছিলেন পারদর্শী, এবং কবির নাটক কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলে এঁরাও অংশগ্রহণ করতেন।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণের বারান্দা' ও 'গগনেন্দ্রনাথ' রাণী চন্দ অনুলিখিত অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে আমার বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। যা আমার কাছে বিস্ময়কর, বোধ হচ্ছে তা হল একটি 'সবজান্তা'–পত্রিকায় এরকম হাস্যকর ভ্রান্তি। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা 'মজারু' হয়ে গেছি। স্মৃতির খিল খুলে অখিলবাবু এ কি পরিবেশন করলেন? নমস্কারান্তে–

ইতি
অশোক সেন।

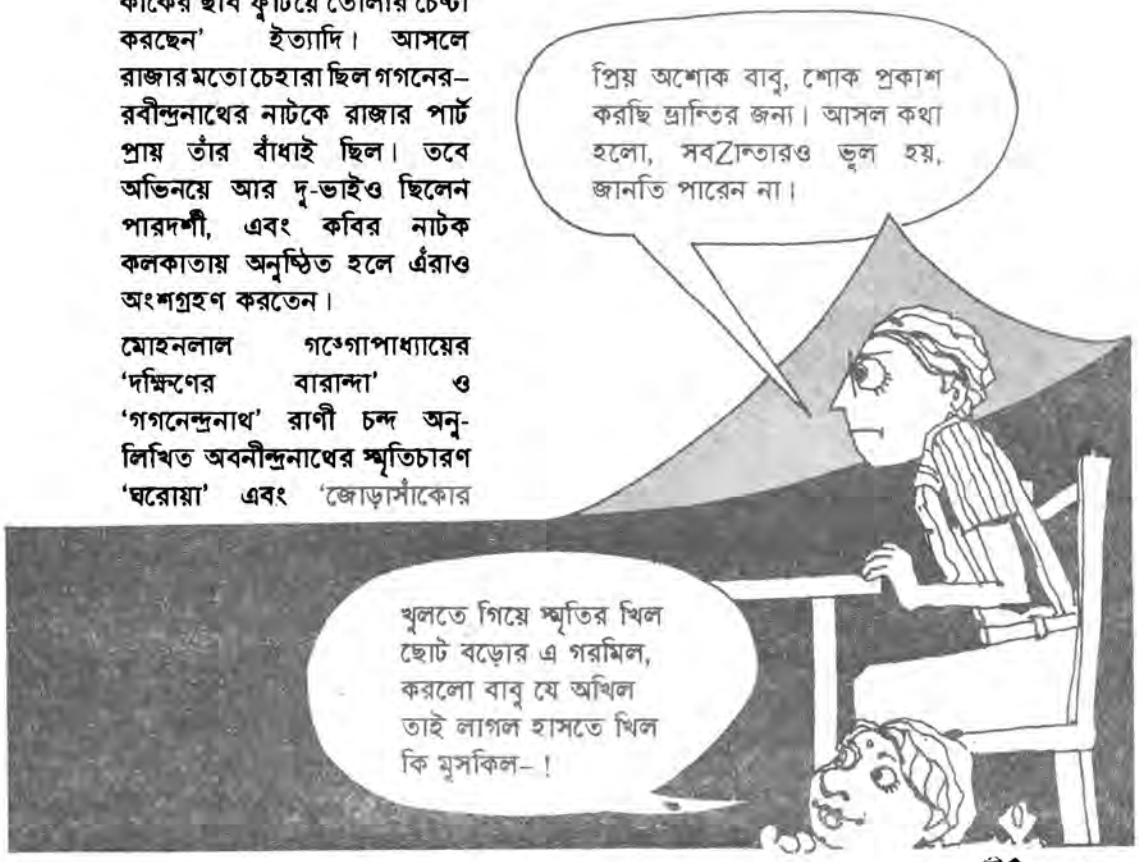

কলকাতার হাওয়া থেমে নেই

কালের যাত্রা থেমে থাকে না। অতীতের সহর আর আজকের সহরে তফাৎ তাই হয়তো অনেক। হুঁকো আর হাতপাখার ট্রাডিশান আজকের ফুগ-বর্মের সঙ্গে পা মিলিয়ে হয় তো সিগারেট আর সিলিং ফ্যানে পর্যবসিত। ক্যালকাটা ফ্যান কলকাতায় কেন এ দেশেই বৈদ্যুতিক পাখার পথিকৃৎ এবং দীর্ঘ ষাট বছর ধরে এ সহরের সেবায় অবিচল থেকে এসেছে।

ক্যালকাটা ফ্যান
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

ABC

ক্যালকাটা ফ্যান - ফ্যান নির্মানের পথিকৃৎ

Happy Family with

Spencer's

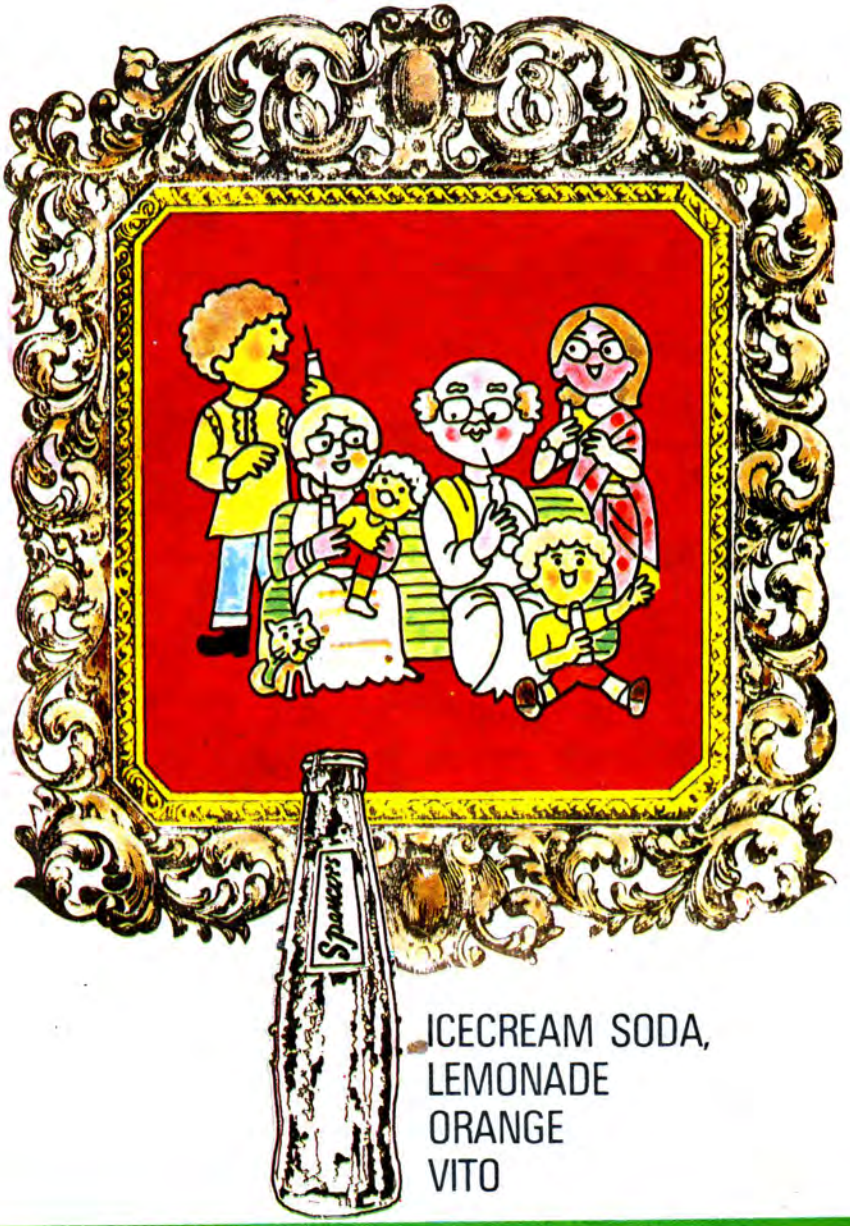

ICECREAM SODA,
LEMONADE
ORANGE
VITO

Bijoli grill spencer's product